একমেবাদ্বিতীয়ং

একাদশ কল্প
তৃতীয় ভাগ

৫০২ সংখ্যা | জ্যৈষ্ঠ ৫৬ ব্রাহ্ম সম্বৎ | ১৮০৭ শক

তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা

ব্রহ্মবাএকমিদমগ্রআসীন্নান্যৎ কিঞ্চনাসীত্তদিদং সর্ব্বমসৃজৎ। তদেব নিত্যং জ্ঞানমনন্তং শিবং স্বতন্ত্রন্নিরবয়বমেকমেবাদ্বিতীয়ম্
সর্ব্বব্যাপি সর্ব্বনিয়ন্তৃ সর্ব্বাশ্রয়সর্ব্ববিৎ সর্ব্বশক্তিমদ্ধ্রুবং পূর্ণমপ্রতিমমিতি। একস্য তস্যৈবোপাসনয়া
পারত্রিকমৈহিকঞ্চ শুভম্ভবতি। তস্মিন্ প্রীতিস্তস্য প্রিয়কার্য্য সাধনঞ্চ তদুপাসনমেব।

নব বর্ষের ব্রাহ্মসমাজ।

ব্রাহ্ম সম্বৎ ৫৬।

অনুশাসন। *

১

ধর্ম্মশূন্য যে মানব পাপী দুরাচার,
অনৃত উপায় বিত্ত অর্জ্জনে যাহার,
হিংসার অনলে সদা দহে যার মন,
ধরায় না লভে সুখ কভু সেই জন।

২

ধর্ম্ম-পথ পর্য্যটনে যদি ক্লান্ত হও,
প্রতি পদ বিনিক্ষেপে বিঘ্ন বাধা পাও;
অধার্ম্মিক পাপীদের বিপর্য্যয় হেরি
অধর্ম্মের দিকে কভু চাহিবে না ফিরি।

৩

অধর্ম্মে আপাত হয় বিষয় বর্দ্ধন,
অধর্ম্মে আপাত হয় কুশল দর্শন,
শত্রুর নিধন হয় অধর্ম্মের বলে,
শেষে কিন্তু সবি নষ্ট অধর্ম্মের ফলে।

৪

বিন্দু বিন্দু মৃত্তিকা করিয়া সংস্থান
পুত্তিকা যেমন করে বল্মীক নির্ম্মাণ
ক্রমে ক্রমে সেইরূপে ধর্ম্ম উপার্জ্জিয়া
পরলোক হেতু ধনে সহায় করিয়া,
হৃদয়ে রাখিয়া স্নেহ দয়া অনুক্ষণ
নাহিক করিবে কোন জীবের পীড়ন।

৫

পরলোকে সঙ্গী হ'তে না রহেন পিতা,
নাহি রহে জ্ঞাতিবন্ধু না রহে বনিতা;
কেবল নরের চির জীবন সহায়
ধর্ম্ম এক বন্ধু হ'য়ে রহেন সেথায়।

৬

একাকী জনমে নর একাকীই মরে
সুকৃত দুষ্কৃত ফল একা ভোগ করে।

৭

কাষ্ঠ মৃত্তিকার সম করিয়া গণন
মৃতের শরীর ভূমে করিয়া ক্ষেপণ
বিমুখ হইয়া ফিরে যায় বন্ধুগণ
ধর্ম্মই তাহার সহ করেন গমন।

৮

অতএব আপনার সাহায্য কারণ
প্রতিদিন ধর্ম্ম-ধন করিবে অর্জ্জন,
ধর্ম্মেরে সহায় করি সংসার আঁধার
সহজে ধার্ম্মিক নর হ'য়ে যায় পার,

* ব্রাহ্মধর্ম্ম—২ খণ্ড ১৬ অধ্যায়।

৯

ধর্ম্মের আদেশ এই ধর্ম্মের শাসন;
ইহাই যতনে সবে করিবে পালন।
ইহাই যতনে সবে করিবে পালন।

আদি ব্রাহ্মসমাজ।

৭ বৈশাখ রবিবার ৫৬ ব্রাহ্ম সম্বৎ।

আচার্য্যের উপদেশ।

সত্য-ধর্ম্মই ব্রাহ্মধর্ম্ম। সত্য কি তাহা না জানিলে ব্রাহ্মধর্ম্ম কি তাহা কখনই জানা যাইতে পারিবে না। সত্যকে জানা কঠিন বলিয়া সত্যকে কি আমরা পরিত্যাগ করিব? আর, মিথ্যাকে সত্য বলিয়া জানা খুব সহজ বলিয়া কি আমরা মিথ্যাকে সমাদর পূর্ব্বক আলিঙ্গন করিব? অধঃপাতে যাওয়া সহজ বলিয়া কি আমরা অধঃপাতের সোপান নির্ম্মাণ করিব? আর, উন্নতিতে আরোহণ করা কঠিন বলিয়া কি আমরা উন্নতির সোপান ভগ্ন করিয়া ফেলিব? "সত্যং বদ ধর্ম্মং চর" সত্য বল—ধর্ম্ম আচরণ কর—এ কথা ছাড়িয়া আমরা কি "অসত্যং বদ অধর্ম্মং চর" এই কথাটিকে আমাদের শিরোভূষণ করিব? যদি নিরাকার নির্ব্বিকার পরমেশ্বরকে সত্য বলিয়া বিশ্বাস না কর, তবে ব্রাহ্মধর্ম্ম অবলম্বন করিও না। কিন্তু যদি এরূপ মনে কর যে, "ঈশ্বর নিরাকার—এ কথাটি অতি সত্য কিন্তু আমার মত সাধকের তাহাতে কোন ইষ্ট-সিদ্ধি হয় না,"—তবে, পৃথিবীতে এমন এক জনও ধর্ম্ম-সাধক আছেন—যাঁহার সত্যেতে কোন ইষ্টসিদ্ধি হয় না—মিথ্যাতেই ইষ্টসিদ্ধি হয়—কি ভয়ানক কথা!—যিনি সত্যেতে কোন ইষ্ট দেখেন না—তিনি যে ধর্ম্মেতে কোন ইষ্ট দেখিবেন তাহারই বা সম্ভাবনা কি? মিথ্যাই যাঁহার ইষ্ট-সিদ্ধির এক মাত্র উপায় হইল, তিনি কিরূপে আপনাকে সত্যের সাধক বলিবেন,—ধর্ম্মের সাধক বলিবেন!—ঈশ্বরকে যিনি সত্যের সত্য বলিয়া শ্রদ্ধা করেন তাঁহার সে আন্তরিক শ্রদ্ধা, আর, যিনি স্বীয় মনের কল্পিত বস্তুতে ঈশ্বরত্ব আরোপ করিয়া তাহাতে শ্রদ্ধা সমর্পণ করেন তাঁহার সে কৃত্রিম শ্রদ্ধা,—দুয়ের মধ্যে আকাশ পাতাল প্রভেদ। ঈশ্বর "নিত্যো ঽনিত্যানাং চেতনশ্চেতনানাং" অনিত্য বস্তু সকলের মধ্যে তিনিই কেবল একমাত্র নিত্য—চেতন-পদার্থ-সকলের তিনিই একমাত্র চেতয়িতা, ইহা সম্পূর্ণরূপে হৃদয়ঙ্গম করিয়া আত্মা দ্বারা আমরা যেন ঈশ্বরের উপাসনা করি;—মনঃকল্পনা—যাহা এই আছে এই নাই—সেই অস্থির মনঃকল্পনা—তাহা দ্বারা ঈশ্বরের সহজ সত্য-সুন্দর-মঙ্গল-ভাবকে আমরা কখনই অলঙ্কৃত করিতে পারিব না—কেবল আবৃত করিয়া ফেলিব—ইহা জানিয়া শুনিয়া ওরূপ কার্য্যে কোন্ সত্য-নিষ্ঠ ব্যক্তি অনুমোদন করিতে পারেন! ঈশ্বর যে আমাদের কত নিকটে তাহা একবার হৃদয়ের সহিত অনুভব করিয়া দেখ,—তাঁহাকে কল্পনা করিতে ইচ্ছা করিও না। আত্মার আধার—বিশ্বের আধার—পরমাত্মাকে যদি আমরা সত্য-সত্যই অন্তর্য্যামী স্বয়ম্ভু নিত্য সত্য বলিয়া না জানি—তবে মিথ্যা-মিথ্যি তাঁহাকে সেরূপে কল্পনা করিলে তাহাতে ফল কি? আর, যদি সত্য-সত্যই জানি যে, তিনি আমাদের নিকটে রহিয়াছেন—তবে তাঁহাকে সাক্ষাৎ উপলব্ধি করিবার জন্য মনশ্চক্ষুকে পাপ-মলিনতা হইতে মুক্ত না করিয়া কল্পনাপটে তাঁহার ছবি আঁকিবার বৃথা আয়াসে আমরা আপনারাই বা প্রবৃত্ত হইব কেন—অন্যকেই বা প্রবৃত্ত করিব কেন? হে সাধক! তুমি যদি সরল হৃদয়ের বিশুদ্ধ জ্ঞানে শুদ্ধ-বুদ্ধ-মুক্ত পুরুষকে

আপনার সাক্ষাৎ প্রভু বলিয়া না জান—তবে তুমি কাহাকে প্রভু বলিয়া বরণ করিতে চাও? তুমি কি আপনার কল্পনাকে আপনার প্রভুপদে বরণ করিতে চাও? সরল হৃদয়ের সত্য-জিজ্ঞাসা ছাড়িয়া লোকরঞ্জন কৃত্রিম উপায়ে ঈশ্বরকে লাভ করিতে চাও? অসীম আকাশ যাঁহার পরিপূর্ণ সত্তা ধারণ করিতে সমর্থ নহে, ক্ষুদ্র একটি মনঃকল্পিত আকারের মধ্যে তাঁহার বাসস্থান নির্দেশ করিতে চাও? ঈশ্বরকে অন্তর হইতে বাহির করিয়া দিতে চাও?—তাঁহার শুদ্ধ বুদ্ধ মুক্ত ভাবকে পরিচ্ছিন্ন আকারে বদ্ধ করিতে চাও?—তাঁহার অন্তর্য্যামিত্ব এবং বিভুত্ব তাঁহা হইতে কাড়িয়া লইতে ইচ্ছা কর? বরং অকূল মহাসমুদ্রকে কূপের মধ্যে আনয়ন করিতে পারিবে—তথাপি পরমাত্মাকে অনিরুদ্ধ অন্তরাকাশ হইতে বাহিরের পরিচ্ছিন্ন আকাশে আনয়ন করিতে পারিবে না! ব্রাহ্মদিগের এই সময়ে ব্রাহ্মধর্ম্মের পথে—মনকে দৃঢ়রূপে রক্ষা করা উচিত; লোক-রঞ্জনার্থে যেন আমরা আমাদের চিরারাধ্য সত্যকে পরিত্যাগ করিয়া মিথ্যার পথে ফিরিয়া না যাই; প্রলোভনে প্রতারিত হইয়া যেন আমরা মিথ্যার পথে ফিরিয়া না যাই; দলবৃদ্ধি করিবার জন্য যেন আমরা মিথ্যার পথে ফিরিয়া না যাই; লোকভয়ে কম্পমান হইয়া যেন আমরা মিথ্যার পথে ফিরিয়া না চাই; সত্যের পথে চলা কঠিন বলিয়া আমরা যেন মিথ্যার পথে ফিরিয়া না চাই! আমরা যেন সত্যের অমায়িক সরল পথ ছাড়িয়া মায়াবীদিগের কুটিল পাক-চক্রময় গোলোক-ধাঁদার ভিতর প্রবেশ না করি! সরল সত্যের অমোঘ সহায় ছাড়িয়া দিয়া আমাদের দশা কি শেষে এই হইবে যে, অন্ধ যেমন অন্ধকর্ত্তৃক নীয়মান হইয়া ঘুরিয়া বেড়ায় সেইরূপ মিথ্যার অভ্যন্তরে বর্ত্তমান থাকিয়া আপনাকে অতিবড় পণ্ডিত মনে করিয়া দন্দ্রম্যমান হইয়া ঘুরিয়া বেড়াইব! সত্যমেব ব্রতং যস্য তেন লোকত্রয়ং জিতং; সত্যই যাঁহার ব্রত তিনি তিন লোক জয় করিয়াছেন, তিন লোক জয় করা কত না কঠিন কার্য্য,—কিন্তু সাধক ব্যক্তি কঠিন কার্য্য সাধন করেন বলিয়াই সাধক নাম প্রাপ্ত হ'ন—যত্নহীন আয়াসহীন ঘুমন্ত সাধককে আর সাধক বলা যাইতে পারে না। সাধকের মুখে এক কথা ছাড়া দুই কথা থাকিতে পারে না—সে কথা এই যে, সত্য তুমি আমাকে যে পথে লইয়া চলিবে সেই পথে যাইব—ধর্ম্ম তুমি আমাকে যে পথে লইয়া চলিবে সেই পথে যাইব—কণ্টকের উপর দিয়া যাইব—পুষ্পের উপর দিয়া যাইব—পর্ব্বত ভেদ করিয়া যাইব—সুখ সমীরণে ভাসিতে ভাসিতে যাইব—অশ্রুপাত করিতে করিতে যাইব—হাস্য করিতে করিতে যাইব—যেদিকে লইয়া যাইবে সেই দিকে যাইব—তাহার এ দিকে বা ও দিকে চাহিব না! সত্যের মধুময় আকর্ষণ—ধর্ম্মের মধুময় আকর্ষণ—ঈশ্বর-প্রেমের মধুময় আকর্ষণ—সাধকের হৃদয়ের একমাত্র পরিচালক—তাহাতেই তিনি চলেন, তাহাতেই তিনি বলেন, তাহাতেই তিনি বর্ত্তিয়া থাকেন, তাহাতেই তিনি নিদ্রা যা'ন, তাহাতেই তিনি জাগ্রত হ'ন—তিনিই সাধক—তিনিই সাধক! সাধকের মুখে কখন দুই কথা থাকিতে পারে না—প্রকৃত সাধকের হৃদয় হইতে এই কথাটি বাহির হইয়াছে।

"তমেবৈকং জানথ আত্মানং অন্যাবাচো বিমুঞ্চথ অমৃতস্যৈষ সেতুঃ,"

এক, সেই পরমাত্মাকেই জানো—অন্য বাক্য-সকল পরিত্যাগ কর—ইনিই অমৃতলাভের সেতু। যাঁহার এক মন, এক লক্ষ্য, এক কথা, সেই সাধকই সাধক—তিনিই সিদ্ধিলাভ করেন—অন্যেরা কে কিসে নীত হইয়া

কোথায় গিয়া পড়ে তাহার কিছুই ঠিকানা নাই। ঈশ্বরের আসনে কেহ বা লোকানুরাগকে, কেহ বা ভাবি ঐতিহাসিক খ্যাতি প্রতিপত্তিকে, কেহ বা আপনার যথেচ্ছগামী মনঃকল্পনাকে আরূঢ় করিয়া কায়মনোবাক্যে তাহারই পূজা করেন—ইহার নাম কি ঈশ্বরারাধনা—না সংসারের দাসত্ব! এ দাসত্ব হইতে ঈশ্বর আমাদিগকে উদ্ধার করুন! হে পরমাত্মন্! আমাদের শত্রু অনেক-সংখ্যক—তুমিই কেবল আমাদের একমাত্র সুহৃৎ; আমরা আপনারা-পর্য্যন্ত আপনাদের শত্রু;—আমরা তোমার সত্যকে ছাড়িয়া আপনাদের ইচ্ছানুযায়ী সত্য গঠন করিতেছি,—আমাদের যাহাতে যাহার অভিরুচি তাহাই তাহার পূজা হইয়া উঠিতেছে—তোমার বিশুদ্ধ আধ্যাত্মিক সত্যে আমাদের মনের দ্বার রুদ্ধ হইয়া যাইতেছে! চারিদিকেই অন্ধকার—কেবল তোমার মুখজ্যোতিই আমাদের এক মাত্র জ্যোতি—তোমার অভয় আশ্রয়ই আমাদের এক মাত্র আশ্রয়,—নিরন্তর তোমাকে যেন আমরা নিকট হইতে নিকটে দেদীপ্যমান দেখি। আমাদের তৃষিত নয়নে তোমার সত্যরূপ প্রকাশ কর—সংসার-সংকট হইতে আমাদিগকে পরিত্রাণ কর।

ওঁ একমেবাদ্বিতীয়ং।

মদ্যমদেয়মপেয়মগ্রাহ্যং।

কতকগুলি কার্য্য আছে তাহারা প্রায় তুল্য রূপে শরীর, মন, হৃদয়, ও আত্মার দুর্গতি সাধন করে—এই সকল কার্য্য মহা পাপ নামের বাচ্য। মদ্যপান এই সকল কার্য্যের মধ্যে একটী। মদ্যপানে যে কেবল শরীর অসুস্থ, দুর্ব্বল ও রোগের আবাসস্থল হয় তাহা নহে, ইহাতে মন বুদ্ধি ও বিবেক-শক্তি নিস্তেজ ও প্রভাহীন হইয়া পড়ে, হৃদয়ের পবিত্র কোমল প্রবৃত্তি-সকল অসাড় হইয়া যায়, এবং আত্মার দৃষ্টি মলিন হইয়া যায়। যে দেশে এই ঘোর অনিষ্টকারী মদ্যপান-রূপ মহাপাপ প্রবেশ করে, সে দেশের আর দুরবস্থার শেষ নাই। যে পরিবার মধ্যে এই মহাপাপ প্রবেশ করে সে পরিবারের দুর্গতির আর অন্ত নাই। বঙ্গদেশের বড় দুর্ভাগ্যের বিষয় উহার ভবিষ্যৎ উন্নতির পক্ষে বড় নিরাশার কথা যে দিনে দিনে বঙ্গে এই মহাপাপ বৃদ্ধি হইতেছে। আবার ইংরাজ-রাজ বঙ্গে সম্প্রতি খোলা ভাঁটীর নিয়ম করিয়া এই পাপ বিস্তারে যথেষ্ট প্রশ্রয় দিতেছেন—আর ক্ষীণমনা দুর্ব্বলহৃদয় আধ্যাত্মিক-বলশূন্য বঙ্গবাসী দলে দলে যাইয়া সেই পাপে নিপতিত হইতেছে। এই বঙ্গদেশে কত সুস্থ ও সবল ব্যক্তি এই মহাপাপ জন্য স্বাস্থ্য হারাইতেছে, অকাল বার্দ্ধক্য প্রাপ্ত হইতেছে, এবং অসময়ে মৃত্যু-গ্রাসে পতিত হইতেছে; কত কত বুদ্ধিমান্ ও বিদ্বান্ ব্যক্তি এই মহাপাপ জন্য আপনারদিগের বুদ্ধি ও বিদ্যা হারাইয়া লোকের সম্মুখে ঘৃণিত ও অপমানিত হইতেছে; কত কত বিবেক-পরায়ণ ব্যক্তি বিবেকশক্তি-চ্যুত হইতেছে এবং রিপুগণের বশীভূত হইয়া পশুর ন্যায় আচরণ করিতেছে; কত কত হৃদয়বান্ ব্যক্তি আপনারদিগের স্বভাবসিদ্ধ ভক্তি, প্রেম, স্নেহ, শিষ্টাচার ও ভদ্রতা হইতে চ্যুত হইয়া মনুষ্যত্ব হারাইতেছে; আর কত কত ব্যক্তি আত্মার দৃষ্টি মলিন করিয়া ঈশ্বর-জ্ঞানে অনধিকারী হইয়া আপনারদিগের আত্মার সুগতির-পথে কণ্টক রোপণ করিতেছে। মদ্যপান-রূপ মহাপাপ জন্য এই বঙ্গে চতুর্দ্দিকে কি শোচনীয় কাণ্ড ঘটিতেছে—একবার তাহা পর্য্যালোচনা করিয়া দেখিলে জ্ঞানশূন্য হইতে হয়।

অপরিমিত মদ্যপানে যে ঘোর অনিষ্ট হয় তাহা ত সকলেই স্বীকার করেন, কিন্তু বঙ্গের ভদ্রসমাজ মধ্যে একদল লোক আছেন তাঁহারা পরিমিত মদ্যপানের পক্ষপাতী—পরিমিত মদ্যপানে যে কোন অনিষ্ট হয়, তাহা তাঁহারা স্বীকার করেন না। ইহাঁদিগের মধ্যে কেহ কেহ ইংরাজদিগের রীতি নীতি অনুকরণ করিবার হীন বাসনা কর্ত্তৃক পরিচালিত হইয়া, কেহ কেহ নব্য বঙ্গসমাজের শিষ্টাচারের অনুরোধে এবং কেহ কেহ বা স্বাস্থ্যরক্ষা হয় মনে করিয়া অল্পমাত্রায় মদ্যপান করিবার রীতির অনুসরণ করিয়া থাকেন। যাঁহারা মনে করেন অল্পমাত্রায় মদ্যপান করিলে তাহা হইতে অনিষ্ট হয় না, তাঁহারা অতি ভ্রমান্ধ। মদ্য একটী প্রচণ্ড বিষ—অল্প হউক, অধিক হউক, কোন কোন রোগাক্রান্ত ব্যক্তি ব্যতীত অন্য সকল লোকের পক্ষেই ইহা অপকারী ও অনিষ্টকর—শরীর, মন, হৃদয় ও আত্মার অবনতিকর। বর্ত্তমান কালের ইউরোপ ও আমেরিকার প্রধান প্রধান শরীর-তত্ত্ববিদ্‌দিগের ইহাই মত, আর ইহাঁদিগের এই মত যে অতি সত্য কার্য্যত আমরা তাহার সম্পূর্ণ প্রমাণ পাইতেছি। পরিমিত মদ্যপানেও যে মহা অনিষ্ট হইয়া থাকে তৎসম্বন্ধে কতকগুলি প্রধান বৈজ্ঞানিকের মত আমরা নিম্নে উদ্ধৃত করিয়া দিলাম।* পরিমিত বা অল্পমাত্রায় মদ্যপান করিবার আর একটী দোষ এই যে উহা অধিক পরিমাণে পান করিবার অদম্য লালসা উদ্রেক করে—এই লালসা এক শতের মধ্যে এক জন লোকও দমন করিতে পারেন কি না সন্দেহ। কোন সুবিজ্ঞ গ্রন্থকার বলিয়াছেন যে বাঁধের এক স্থানে ছিদ্র রাখা ও পরিমিত মদ্যপান করা একই কথা—বাঁধের ছিদ্রের মধ্যে দিয়া একটু একটু করিয়া জল নির্গত হইয়া যেমন সমস্ত দেশকে প্লাবিত করে, তেমনি একটু একটু মদ্যপান করিয়া মহা অনর্থ সাধিত হয়। দেখা যাইতেছে যে অধিকমাত্রায় হউক বা অল্পমাত্রায় হউক মদ্যপান মনুষ্যের পক্ষে ঘোর অহিতকারী, মহাপাপ। এই জন্যই পূতচরিত্র হিন্দুগণ উপদেশ দিয়া গিয়াছেন "মদ্যমদেয়মপেয়মগ্রাহ্যং" "অন্যকে মদ্য দিবে না, আপনি পান করিবে না, একেবারে ছোঁবেনা"—ইহাই সনাতন ধর্ম্ম। যাহা মহাপাপ, নিজে তাহাতে প্রবৃত্ত না হইয়া যদি অন্যকে তাহাতে প্রবৃত্ত করি

* Dr James Miller says, "Alcohol kills in large doses, and half kills in smaller ones It produces insanity, delirium, fits. It poisons the blood and wastes the man." Dr Gordon says;—"Leaving drunkenness out of the question, the frequent consumption of a small quantity of spirits, gradually increased, is as surely destructive of life, as more habitual intoxication" Professor Hitchcock observes, "The use of spirits, even in the greatest moderation, tends to shorten life." Dr R. G. Dods remarks,—"No one is safe from the spproach of countless maladies who is in the daily habit of using even the smallest portion of ardent spirits. The practice can not possibly do any good, and it has often done much harm." Dr Lettson has recorded the following result of his observation;—"Nearly all the illness of my adult patients, and most of the cases of sudden deaths, are occasioned by the practice of taking a glass of spirits and water after dinner." Dr Harris, in an official report to The Secretary to the American Navy, states, "the moderate use of spirituous liquors has destroyed many who were never drunk." Dr Brewster remarks;—"It is enough to observe that the habitual use of intoxicating drinks, even within the limits of what is commonly deemed sobriety, is equally destructive to the health of body and mind." Dr. A. S. Thomson observes,—"Wine, even in moderation, when daily used, is equally hurtful; it over stimulates, and consequently exhausts the powers of life." Dr Rush declares; "I have known many persons destroyed by ardent spirits who were never completely intoxicated during the whole course of their lives.

কিম্বা করিতে সাহায্য করি তাহা হইলেও পাপ করা হয়, এইজন্য উক্ত হইয়াছে, "মদ্য মদেয়মগ্রাহ্যং" অর্থাৎ অন্যকে মদ্য দিবে না, একেবারে স্পর্শ করিবে না। আজ কাল ইংরেজী সভ্যতানুসারে বঙ্গের নব্য সমাজে এরূপ রীতি দাঁড়াইয়া গিয়াছে যে যিনি নিজে মদ্যপান করেন না, তিনি যদি মদ্যপানাসক্ত কয়েকটী বন্ধুকে নিমন্ত্রণ করেন, তাহা হইলে তিনি তাঁহাদিগের প্রমোদার্থ মদ্যের বিশেষ আয়োজন করিয়া থাকেন, পরে হয়ত আহারান্তে স্বহস্তে তাঁহাদিগকে মদ্য ঢালিয়া দিয়া সৌজন্যের চরম দৃষ্টান্ত দেখাইলেন মনে করিয়া আপনাকে পরিতৃপ্ত বোধ করেন। এরূপ সৌজন্য যে নিতান্ত ধর্ম্ম-বিরুদ্ধ, ইহা তাঁহারদিগের মনে হয় না; ইহা বড় আশ্চর্য্য। এরূপ সৌজন্য দ্বারা মদ্যপান রূপ পাপের প্রতি উৎসাহ প্রদান করা হয়, অন্যকে ঐ পাপ করিতে সাহায্য করা হয় এবং তজ্জন্য ধর্ম্ম হইতে পতিত হইতে হয়; ইহা তাঁহাদের সম্যকরূপে হৃদয়ে ধারণ করা উচিত।

প্রাচীন ভারতে শিক্ষা।

(পূর্ব্বের অনুবৃত্তি)

হিন্দুজাতির নিকট ঐহিক কিছুই নহে, পারত্রিকই যথাসর্ব্বস্ব। যাগ যজ্ঞ দান ব্রত উপবাস যা কিছু বল পারত্রিক ফললাভ তাহার একমাত্র লক্ষ্য। পরকালের উপর হিন্দুজাতির এইরূপই বিশ্বাস। সমস্ত কৃচ্ছ্র-সাধন কেবল ইহারই বলে। এই জন্য ধর্ম্মটী তাহাদের শিক্ষা-প্রণালীর অন্তর্নিবিষ্ট ছিল। ইহাই আত্মার শিক্ষা। কিন্তু এস্থলে এমন কেহ বুঝিও না যে পূর্ব্বকালে কতকগুলি মতের সমষ্টিতে বিশ্বাস দাঁড় করাইতে পারিলেই ধর্ম্মশিক্ষার চূড়ান্ত হইত। ছাত্রের ধর্ম্ম কেবল মতে নয় কার্য্যে ছিল। তাহাকে ত্রিকালীন স্নান করিয়া দুইবার সন্ধ্যাবন্দন ও অগ্নিপরিচর্য্যা করিতে হইত[১]। ইহাই উপাসনা।

ধর্ম্ম দুই প্রকার প্রবৃত্তি-লক্ষণ ও নিবৃত্তি-লক্ষণ অর্থাৎ স্থূল ও সূক্ষ্ম। যাগযজ্ঞাদি প্রবৃত্তি-লক্ষণ বা স্থূল ধর্ম্ম এবং ব্রহ্মজ্ঞান নিবৃত্তি-লক্ষণ বা সূক্ষ্ম ধর্ম্ম। এস্থলে দেখা যাইতেছে যে অষ্টমবর্ষীয় ছাত্রের প্রথমে স্থূল ধর্ম্মে দীক্ষা হইত। সূক্ষ্ম ধর্ম্ম জ্ঞান-সাপেক্ষ। বোধ হয় বালকের কোমল মন ইহা গ্রহণ করিবার উপযোগী নয় ঋষিরা এরূপই বুঝিতেন। যাঁহারা স্থূল ধর্ম্মকে ভবার্ণবের পরপার গমনে অদৃঢ় ভেলা বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন[২]; যাঁহারা বলিয়া গিয়াছেন যে নারিকেল ফলের জল ও শস্য লাভ হইলে যেমন তাহার অসার ভাগ (ছিব্‌ড়া) ত্যাগ করিতে হয়, ফলোদ্গম হইলে ফুলটী যেমন আপনা হইতেই ঝরিয়া যায় সেইরূপ ব্রহ্মজ্ঞান লাভ হইলে স্থূল-ধর্ম্মকে হয় ত্যাগ করিতে হইবে অথবা ইহা আপনা হইতেই বিলোপ পাইবে; তাঁহারাই যে আবার স্থূল ধর্ম্মকে শিক্ষার অন্তর্নিবিষ্ট করিয়া যান, ইহার অবশ্য কোন হেতু আছে। ঋষিরা স্পষ্টই বলিয়াছেন যে স্থূল ধর্ম্মে ভববন্ধন হইতে মুক্তি নাই কিন্তু এদিকে আবার মনুষ্যকে ধর্ম্মশূন্য করিয়া রাখাও শ্রেয় নহে। সূক্ষ্ম ধর্ম্ম লাভের জন্য প্রাণপণ কর, কিন্তু যত দিন তাহা না পাইতেছ তাবৎ স্থূল ধর্ম্ম লইয়া আত্ম-তৃপ্তির চেষ্টা দেখ। আশ্রম ধর্ম্ম নির্দ্দেশকালে ঋষিদিগের এই অভিপ্রায় বিলক্ষণ প্রকাশ পায়। তাঁহারা জ্ঞান-লক্ষণ প্রব্রজ্যার প্রাধান্য দিয়াছেন, কহিয়াছেন জ্ঞানের পক্ষে কালাকাল নাই। যখন

১ কালদ্বয়মভিষেকাগ্নিকর্ম্মকরণম্। বিষ্ণু সূত্র।
২ প্লবাহ্যেতে অদৃঢ়া যজ্ঞরূপাঃ। শ্রুতি।

জ্ঞানোদয় হইবে তদ্দণ্ডেই প্রব্রজ্যা গ্রহণ করিতে পারিবে [৩]। এস্থলে দেখিতেছি ব্রহ্মচর্য্য না করিয়া যেমন কেহ গার্হস্থ্যে কিম্বা গার্হস্থ্য না করিয়া যেমন বানপ্রস্থে প্রবেশ করিতে পারে না, প্রব্রজ্যার পক্ষে সে বিধি নয়। যখনই জ্ঞানোদয় হইবে, তখনই প্রব্রজ্যা আশ্রয় করিতে পারে। ইহার তাৎপর্য্য এই সূক্ষ্মধর্ম্ম যখনই হৃদ্বোধ হইবে, তখনই তাহা আশ্রয় ও তদনুসারে কার্য্য করা আবশ্যক। ইহাতে কাল ও আশ্রমের কোন প্রতিবন্ধকতা নাই।

বাল্যকালে সকল প্রকার সংস্কার সহজে বদ্ধমূল হয়। বয়োধর্ম্মে দুষ্প্রবৃত্তি ও তর্ক-তরঙ্গ উত্থিত হইয়া মনকে আকুল ও সংশয়ান্বিত করিতে পারে। এজন্য বাল্যকালই ধর্ম্মবীজ বপন করিবার প্রকৃত সময়। পূর্ব্বে তাহাই হইত। পরে যখন গার্হস্থ্যের পরার্থ-প্রধান কঠোর কর্ত্তব্য বহন করিবার সময় আসিত, তখন এই অন্তর্নিহিত গূঢ় বীজ উদ্ভিন্ন হইয়া অতি মধুময় ফল প্রসব করিত। গৃহস্থ ইহারই বলে জীবনের সকল প্রকার রহস্য বুঝিতে পারিত। সংসার-সমুদ্রের নানারূপ আবর্ত্তের মধ্যে পড়িয়াও আপনার পদ অটল রাখিতে সমর্থ হইত এবং কঠিন লৌহকেও পুষ্পকোরকবৎ কোমল বুঝিত। কারণ ধর্ম্মই মনুষ্যের প্রকৃত বল, ধর্ম্ম সহায় হইলে দুস্তর অন্ধকারও সুখে উত্তীর্ণ হওয়া যায়।

দ্বিকালীন স্নানের একটু তাৎপর্য্য আছে। অন্তঃশুদ্ধি বাহ্যশুদ্ধি সাপেক্ষ। যাহার শরীর অশুচি থাকে, অন্তঃশুদ্ধি তাহার পক্ষে একটী কষ্টকর ব্যাপার। ফলত ইহার অভাবে আত্ম-সমাধানের ব্যাঘাত ঘটে।

এক্ষণে মানসিক শিক্ষা কিরূপ হইত, তাহা প্রদর্শন করা আবশ্যক। শিক্ষার্থী ছাত্র সর্ব্বাগ্রে বেদপাঠ করিত। যে ব্রাহ্মণ বেদাধ্যয়ন না করিয়া অন্য শাস্ত্রের আলোচনা করিত সে সবংশে শূদ্র হইয়া যাইত [৪]। বেদ ব্রহ্মবিদ্যা। যাঁহারা ধর্ম্মকে সার পদার্থ বলিয়া জানিতেন ধর্ম্ম-গ্রন্থ যে তাঁহাদের প্রথম পাঠ্যের মধ্যে নির্ব্বাচিত হইবে, ইহা একটা আশ্চর্য্যের কথা নহে। কিন্তু এই বেদ প্রথমে অর্থপ্রতীতির সহিত পাঠ করিবার রীতি ছিল না। সকলে ইহা আদ্যোপান্ত কণ্ঠস্থ করিত। যখন অক্ষরের সৃষ্টি হয় নাই, যখন গ্রন্থ নামে কোন পদার্থ ছিল না, তখন ব্রহ্মচারিরা সংযত হইয়া এই বেদ কণ্ঠস্থ করিত। পরে যখন অক্ষরের সৃষ্টি হইয়াছিল, তখন এবং সেই সময় হইতে এখনও এই রীতি অনুসৃত হইয়া থাকে। মুখে অভ্যাস রাখিতে হয়, এই জন্য বেদের একটী নাম আম্নায় [৫]। কিন্তু সমস্ত গ্রন্থ মুখস্থ রাখা বড় সহজ কথা নয়। দাক্ষিণাত্যে এখনও কিরূপ প্রণালীতে ছাত্রেরা বেদ মুখস্থ করে এস্থলে তাহার কিঞ্চিৎ আভাস দেই। মনে কর আমি কোন একটী ঋকের শেষ পাদের কিংবা পাদার্দ্ধের উল্লেখ করিলাম, শিক্ষার্থী ছাত্র সেই ঋকের পূর্ব্বপাদ আবৃত্তি করিয়া প্রশ্ন পূরণ করিল। আমি মন্ত্রগত কোন একটী বিশিষ্ট দেবতা বা শব্দের উল্লেখ করিয়া জিজ্ঞাসিলাম এই দেবতা বা শব্দ কোন্ কোন্ ঋকে আছে। ছাত্র তৎক্ষণাৎ তাহার উত্তর দিল। এই এক একটী ছাত্র যেন জীবিত বৈদিক পুস্তকালয়। ইহাদের নিকট বেদের যে কোন স্থান চাও, ইহারা তৎক্ষণাৎ তাহা আবৃত্তি করিয়া দিবে। পূর্ব্বেও এইরূপ রীতিতে শিক্ষা হইত। কিন্তু কেবল স্মৃ-

৩ যদহরেব বিরজেৎ তদহরের প্রব্রজেৎ। শ্রুতি।

৪ যস্ত্বনধীতবেদোন্যত্র শ্রমং কুর্য্যাদসৌ সসন্তানঃ শূদ্রত্বমেতি। বি, স্মৃ।

৫ আম্নায়তে অভ্যস্যতে আম্নায়ঃ।

তিতে গ্রন্থরক্ষার অনেক বিপদ। ইহাতে পদে পদে পাঠ বিপর্য্যস্ত হইবার সম্ভাবনা। বেদকে এই পাঠবিপর্য্যয় হইতে রক্ষা করিবার নিমিত্ত সংহিতা পদ ক্রম জটা ঘন প্রভৃতি কতকগুলি পাঠগ্রন্থ আছে। ইহা সর্ব্বশুদ্ধ আটপ্রকার। ইহাকে অষ্ট বিকৃতি বলে। এই সংহিতা পদ ক্রম প্রভৃতি যে কি এবং ইহা দ্বারা কিরূপে যে বেদের পাঠ রক্ষা হয় প্রাতিসাক্ষ্য নামক বৈদিক গ্রন্থ যাঁহারা আলোচনা করিয়াছেন, ইহা তাঁহাদের অবিদিত নাই। আমরা প্রস্তাব-বাহুল্য-ভয়ে এস্থলে তাহার সবিশেষ উল্লেখ করিলাম না। ফলতঃ শিক্ষার্থী ছাত্রকে এই সমস্ত পাঠ-গ্রন্থ সমগ্র বেদের সহিত কণ্ঠস্থ করিতে হইত। পরে বেদের অর্থগ্রহ। এইরূপ পূর্ব্বতন প্রণালীর শিক্ষায় বিশেষ উপকার আছে, এবং এই শিক্ষাই স্বাভাবিক। ইহাতে স্মৃতি ও বুদ্ধি দুয়েরই বৃদ্ধি হয়। আর ইহাকে যে স্বাভাবিক বলিলাম, তাহার একটু কারণ আছে। শিশু জন্মগ্রহণের পর হইতে পদার্থ চিনিতে ও তাহা স্মরণ রাখিতে চেষ্টা করে। যাঁহারা শিশুর দোলার উপর রক্তবস্ত্রাদি ঝুলাইয়া এই ভাবটী পরীক্ষা করিয়াছেন, তাঁহাদিগকে শিশুর বস্তু চেনা ও স্মরণ রাখার কথা বুঝাইতে হইবেনা। ইহাতে প্রমাণ হয় যে সর্ব্বাগ্রে শৈশবে স্মৃতিশক্তিরই স্ফূর্ত্তি হয়। স্মৃতি যে জ্ঞানটুকু আনে, তদ্দ্বারা ক্রমশঃ বিচারের উৎপত্তি ও বুদ্ধি স্ফূর্ত্তি হইতে থাকে। এই তো স্বভাব; পূর্ব্বতন শিক্ষা-প্রণালী ইহারই অনুকূল। ছাত্র অগ্রে স্মৃতি পরে বুদ্ধিবৃত্তির চালনা করিত। এবং এখনও চতুষ্পাঠীতে সামান্যত এই রীতি অনুসৃত হইয়া থাকে। যে লতা নৈসর্গিক নিয়মে বাড়ে বাধা না পাইলে সে সর্ব্বতোমুখী হয়। পূর্ব্বে ব্যাস বাল্মীকি প্রভৃতির বুদ্ধি তাহাই হইত। এস্থলে প্রসঙ্গ-সঙ্গতি ক্রমে একটী কথা আসিতেছে। আমরা বলিয়াছি ধর্ম্ম তখনকার শিক্ষার একটী শাখা। পরে দেখাইলাম বুদ্ধিবৃত্তির সর্ব্বতোমুখতা। এখন বক্তব্য এই যে তখনকার কল্পনার যে গভীরতা ও সম্প্রসারণ তাহা এই মণিকাঞ্চন-যোগেরই একটী অব্যর্থ ফল। পূর্ব্বতন কাব্য নাটক পুরাণ যে কোন গ্রন্থ আলোচনা কর দেখিবে কবি যাহা বলিবেন বা করিবেন অন্তর্ভেদী দৃষ্টিতে যেন তাহার চতুর্দ্দিকটা অগ্রে দেখিতেছেন। যাহাতে বর্ণনীয় বিষয়টী পূর্ণাবয়ব হইয়া উঠে, তাহার কোথায় কি অভাব, কোথায় কি দিলে তাহা সর্ব্বাঙ্গসুন্দর হয়, ইহা তিনি যেন সহস্র নেত্রে তন্ন তন্ন করিয়া পরীক্ষা করিতেছেন। প্রাসাদের আড়ম্বর, কুটীরের অবসাদ, বীরের দম্ভ, দুর্ব্বলের আর্ত্তনাদ, স্বাস্থ্যের সঞ্জীবতা, রোগের বিষাদ, স্বর্গের মহোল্লাস, নরকের হাহাকার যেন তিনি জীবন্ত মূর্ত্তিতে দেখাইতেছেন। জগতের সমস্ত রহস্যের কুঞ্চিকা যেন তাঁহার হস্তে। তিনি কবাট উদ্ভিন্ন করিয়াছেন, ইচ্ছা যে জগতের সকলেই তাহাতে প্রবেশ করুক। তিনি তন্মধ্যে গিয়া করুণার্দ্র হৃদয়ে সমস্ত দেখিতেছেন। তাঁহার চিত্ত ভালমন্দ বিচারে ব্যস্ত। একদিকে পাপের নরককুণ্ড ও অপর দিকে পুণ্যের স্বর্গধাম বিভাগ করিয়া রাখিতেছে। ইহা পদ্মের সৌরভ-মাধুরী আনিয়া মন মোহিত করে আবার দুর্গন্ধময় অন্ধকার গর্ভের অস্বাস্থ্যকর বিষবায়ু আনিয়া অস্থির করিয়া তুলে। এইরূপ সমস্ত ভাব-পরম্পরার মধ্যে আমরা কেবল কবিরই নৈতিক দৃষ্টির পরিচয় পাই। অনেক চরিত্র-মাহাত্ম্যে তাঁহাকেই প্রতিবিম্বিত দেখি এবং অনেক চরিত্র-দৌরাত্ম্যে তাঁহারই ঘৃণা দেখি। এই টুকু সেই প্রাচীন শিক্ষা-প্রণালীর সুফল—এখন আর ধর্ম্ম শিক্ষার অন্তর্নিবিষ্ট নাই, মর্ম্মস্পর্শী কবিত্বও ভারতবর্ষ হইতে প্রস্থান করিয়াছে।

পূর্ব্বকালে কেবল যে মানসিক শিক্ষা হইত তাহা নহে, ইহার সহিত সদাচার ও সভ্যতার শিক্ষা ছিল। ইহাই হৃদয়ের শিক্ষা। আমরা ইহা প্রদর্শন করিবার পূর্ব্বে আচার্য্য ও ছাত্র সম্বন্ধে দুই এক কথা বলিয়া লই। যিনি উপনীত করিয়া বেদ অধ্যাপন করেন তিনি আচার্য্য [১]। জন্মদাতা পিতা ও আচার্য্যের মধ্যে আচার্য্যই গরীয়ান্। পিতা মাতা হইতে কেবল নাম মাত্র জন্ম হয় কিন্তু বেদপারগ আচার্য্য সাবিত্রী দীক্ষা দ্বারা যে জন্মের বিধান করিয়া থাকেন তাহাই সত্য তাহাই অজর ও অমর। যিনি ধর্ম্মযোনির কর্ত্তা, যিনি স্বধর্ম্মের শাস্তা, অল্পবয়স্ক হইলেও তিনি ধর্ম্মত পিতা। শাস্ত্রে আচার্য্য সম্বন্ধে এইরূপ প্রশস্ত ভাব দেখা যায়। ছাত্রেরও লক্ষণ আছে। ছাত্র পরীক্ষিত হওয়া চাই [২]। যাহার অন্তরে ধর্ম্ম এবং শ্রবণেচ্ছা নাই, তাহাকে বিদ্যাদান নিষ্ফল। ঊষর ক্ষেত্রে বীজবপনের ন্যায় ইহাতে কোন ফলোদয় হয় না। বিদ্যা আসিয়া আচার্য্যকে কহিল [৩] ভগবন্! আমি তোমার সেবক, আমায় রক্ষা কর। যে ব্যক্তি অসূয়ার বশবর্ত্তী অসরল ও অসংযত, তাহাকে আমায় বলিও না। ইহাতে আমার বীর্য্যের হ্রাস হইবে। তুমি যাহাকে শুদ্ধস্বভাব অপ্রমাদী মেধাবী ও ব্রহ্মচর্য্যে নিষ্ঠাবান জানিবে, যে কোনও রূপে তোমার অপ্রিয়াচরণ করিবে না, তুমি তাহাকেই আমায় বলিও। ছাত্রের ইহাই লক্ষণ। এই ছাত্রের অনেক কর্ত্তব্য ছিল। আচার্য্য আদেশ করুন আর নাই করুন, ইহাকে নিয়ত অধ্যয়নে যত্ন করিতে হইত। সে পাঠ লইবার সময় শরীর বাক্য ইন্দ্রিয় বুদ্ধি ও মন সংযত করিয়া কৃতাঞ্জলিপুটে গুরুর প্রতি দৃষ্টিপাত করিত। গুরু উপবেশনে আদেশ করিলে বসিত। গুরুর নিকট সর্ব্বদা হীনঅন্ন ও দীনবেশে থাকিত। গুরুর নিদ্রাভঙ্গের পূর্ব্বে গাত্রোত্থান এবং শয়নের পরে বিশ্রাম করিত। শয়ন, আসনে উপবেশন, ও ভোজনকালে গুরুর সহিত সম্ভাষণ বা তাঁহার কোন কথা শ্রবণ করিত না। শুনিবার সময় মুখ ফিরাইয়া থাকা অসদাচার। যখন গুরু উপবেশন করিয়া আছেন তখন বসিয়া, যখন গমন করিতেছেন তখন অনুসরণ এবং যখন আসিতেছেন তখন প্রত্যুদ্গমন করিয়া তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিবার রীতি ছিল। গুরু বিমুখ হইলে সম্মুখে গিয়া, দূরস্থ হইলে নিকটে গিয়া এবং শয়ান থাকিলে প্রণাম করিয়া তাঁহার আদেশ গ্রহণ করিত। পরোক্ষেও গুরুর নাম গ্রহণ নিষিদ্ধ। তাঁহার আকার ইঙ্গিত ও কথাবার্ত্তার অনুকরণ অপরাধের মধ্যে গণ্য হইত। গুরুর নিন্দাবাদ শুনিলে কর্ণে অঙ্গুলি প্রদান বা তথা হইতে প্রস্থান করিত। ছাত্র যদি কোনরূপ যানে বা আসনে থাকে তাহা হইলে অবতরণ পূর্ব্বক গুরুকে অভিবাদন করিত। প্রতিবাত বা অনুবাতে গুরুর সহিত বসিত না। গো অশ্ব উষ্ট্র শিলাফলক ও নৌকায় গুরুর সহিত বসিতে পারিত। গুরুর গুরু সন্নিহিত হইলে তাঁহাকে গুরুবৎ দেখিতে হইত। পিতা উপস্থিত হইলেও গুরুর আদেশ ব্যতীত তাঁহাকে অভিবাদন করিত না। গুরুপুত্র বয়সে ছোট বা বড়ই হউন তিনি অবশ্যই গুরুবৎ মাননীয় কিন্তু তাঁ-

১ যস্তু নীয় ব্রতাদেশং কৃত্বা বেদমধ্যাপয়েত্তমাচার্য্যং বিদ্যাৎ। বি, স্মৃ,

২ না পরীক্ষিতমধ্যাপয়েৎ। বি, স্মৃ।

৩ বিদ্যা হবৈ ব্রাহ্মণমাজগাম
গোপায় মা সেবধিস্তেঽহমস্মি।
অসূয়কায়ানৃজবেঽযতায়
ন মাং ব্রূয়া বীর্য্যবতী তথাস্যাম্।
যমেব বিদ্যাঃ শুচিমপ্রমত্তং
মেধাবিনং ব্রহ্মচর্য্যোপপন্নং
যস্তে ন দ্রুহেৎ কতমচ্চ নাহ
তস্মৈ মাং ব্রূয়া নিধিপায় ব্রহ্মণ্য বি, স্মৃ,

ঈশ্বর আমাদের আত্মা হইতে তিরোহিত হইলেই আত্মার ধ্বংস। আমরা আত্মাকে যে অবিনশ্বর বলি সে কেবল ঈশ্বরের আবির্ভাব বশতঃ; যে আত্মাতে ঈশ্বর অধিবাস করেন এবং যে আত্মা ঈশ্বরে অধিবাস করে তাহাই প্রকৃত আত্মা; আত্মজ্ঞান ভিন্ন আত্মার অবিনশ্বরত্ব দূরে থাকুক তাহার স্থায়িত্বই সম্ভবে না, এরূপ আত্মা আছে বলিয়াই বলা যায় না; যেমন উত্তাপের অভাবে জড় জগতের জীবনের নাশ হয় সেইরূপ ঈশ্বর-জ্ঞান ব্যতিরেকে আত্মার নাশ হয়। এই নিমিত্তই ব্রাহ্মধর্ম্মে বলে যে "যদি আমরা তাঁহাকে না জানিতাম তবে মহাবিনাশ প্রাপ্ত হইতাম"।

অগ্নির দ্বিতীয় গুণ আলোক। সংসারে আলোক না থাকিলে সকলই তিমিরাচ্ছন্ন অন্ধকারাবৃত হইত। আলোক না থাকিলে আমাদিগের দর্শনেন্দ্রিয় প্রভৃতি অকর্ম্মণ্য হওয়াতে মানসিক বৃত্তি সকলও যে স্ফূর্ত্তি পাইতে পারিত না এবং প্রকৃতির মনোহর কান্তি ও উজ্জ্বল ভাব সমস্ত নিরীক্ষণ করিয়া আমরা পরাৎপর পরমাত্মার অপার করুণা ও নিরূপম আশ্চর্য্য কৌশল ও অনন্ত মঙ্গলস্বরূপের যে পরিচয় প্রাপ্ত হই তাহাও পাইতে পারিতাম না এবং তন্নিবন্ধন আমরা ঈশ্বরজ্ঞানলাভে বঞ্চিত ও অন্যান্য অনেক প্রকারে যে যার পর নাই ক্ষতিগ্রস্ত হইতাম তাহার উল্লেখ করা এস্থলে অনাবশ্যক; কেবল এইমাত্র বলিলেই যথেষ্ট হইবে যে পৃথিবীতে আলোক না থাকিলে পুষ্প সমুদায় সুচারুরূপে প্রস্ফুটিত হইতে পারিত না, মনোহর এবং নবপল্লবাবৃত বৃক্ষ সদ্যোদ্ভূত তৃণাদি সুন্দর শ্যামল বর্ণ প্রাপ্ত হইতে পারিত না, নানা বর্ণে সুশোভিত জগত বর্ণহীন এবং শোভাশূন্য হইত, প্রকৃতির অপূর্ব্ব কান্তি ও মধুরতা লোপ হইত, এমন কি সমস্ত পৃথিবী কণ্টকাবৃত বনে বা বালুকাময় শুষ্ক মরুভূমিতে পরিণত হইত, শোক এবং অশান্তি জগৎময় বিরাজ করিত। সেইরূপ ব্রহ্মজ্ঞানরূপ স্বর্গীয় আলোকে আত্মা আলোকিত না হইলে মোহান্ধকারে আত্মা পরিপূরিত হয়, ব্রহ্মজ্ঞান ও পরমাত্মার বিমল জ্যোতির অভাবে মানবাত্মা ভক্তি ও প্রেম শূন্য হইয়া শুষ্ক ও নীরস হইয়া পড়ে; ঈশ্বরের পবিত্র আলোকের অভাবে হিতাহিত জ্ঞান থাকে না, কি ধর্ম্ম কি অধর্ম্ম, কি পাপ কি পুণ্য, কোন্‌টি ঈশ্বরের অপ্রিয় ও কোন্‌টি তাঁহার প্রিয়কার্য্য তাহা বুঝিতে না পারিয়া আত্মা হতাশ হইয়া পড়ে, ধর্ম্ম অস্তমিত হওয়াতে কেবল পাপের রাজ্য আত্মাতে বিস্তৃত হয়, আমাদের একমাত্র নেতা ও পথপ্রদর্শককে দেখিতে না পাইয়া আত্মা পথহারা, কর্ত্তব্যবিমূঢ় ব্যক্তির ন্যায় আপনার সর্ব্বনাশ আপনিই করে। সেই জ্যোতির অভাবে অন্ধবৎ পাপের দুস্তর পঙ্কে পতিত হইয়া সমূলে বিনষ্ট হয়।

অগ্নির তৃতীয় গুণ তাহার দাহিকা শক্তি। সেই দাহিকা-শক্তি-প্রভাবে অগ্নি যে কেবল সমুদায় ভস্মসাৎ করে তাহা নহে, দাহিকা শক্তির একটী প্রধান গুণ পদার্থ সমূহের দূষণীয় ভাগ নষ্ট করিয়া তাহাকে পরিষ্কৃত করা। এই সদ্য-প্রকাশিত নব সূর্য্য যেমন ভূমির ক্লেদ ও নৈশ বায়ুর অস্বাস্থ্যকর পরমাণু সমস্ত নষ্ট করিয়া পৃথিবীকে পরিষ্কৃত ও পরিচ্ছন্ন এবং প্রভাত-সমীরণকে স্বাস্থ্যকর ও তৃপ্তিপ্রদ করিতেছে, অগ্নি যেমন সুবর্ণের শ্যামিকা বা অসার ভাগ নষ্ট করিয়া তাহাকে পবিত্র ও উজ্জ্বল করে, ব্রহ্মজ্ঞানরূপ স্বর্গীয় অগ্নি সেইরূপ আত্মার পাপ তাপ ধ্বংস করিয়া তাহাকে পবিত্র ও পরিশুদ্ধ করে। স্বর্গীয় ব্রহ্মজ্ঞানের প্রভাবে দুশ্চিন্তা, পাপলালসা, বিষয়-তৃষা সমস্ত বিদূরিত হয়—দুষ্প্রবৃত্তি সমূহ বিনষ্ট হয়—পাপের ও সংসারের প্রলোভন সমস্ত

হার উচ্ছিষ্ট ভোজন বা পদসংবাহন করা নিষিদ্ধ। গুরুর সবর্ণা স্ত্রী গুরুবৎ পূজনীয়া কিন্তু অসবর্ণা স্ত্রীকে প্রত্যুত্থান ও অভিবাদন করিলেই যথেষ্ট হইত। গুরুপত্নী যদি যুবতী হন তাহা হইলে তাঁহার পাদগ্রহণ দূষণীয়। 'আমি অমুক' এই বলিয়া প্রণাম করিতে হইত। এই সমস্ত সদাচার ও সভ্যতা। পূর্ব্বে অতি যত্ন সহকারে ছাত্রকে এই সমস্ত শিক্ষা করিতে হইত। বুদ্ধিবলে পদ-পদার্থ-বোধ জ্ঞানের পক্ষে যথেষ্ট নয়। যে জ্ঞান হৃদয়কে বিনীত করে তাহাই জ্ঞান। প্রাচীন ভারত তাহা বুঝিয়াছিল এবং হৃদয়ের শিক্ষাকে সমধিক মূল্যবান বোধ করিত।

কেবল কতকগুলা আহার করিলেই হয় না তাহা জীর্ণ করা এবং তদ্দ্বারা রসরক্তের বৃদ্ধি করা চাই, এই জন্য ছাত্রদিগের কতকগুলি নির্দ্দিষ্ট অনধ্যায় কাল ছিল। চতুর্দ্দশী ও অষ্টমীতে অহোরাত্র পড়িত না। গ্রীষ্ম শীত বর্ষাদি ঋতুসন্ধির দ্বিতীয়া, চন্দ্র সূর্য্যগ্রহণ ও শক্রোত্থানে অনধ্যায়। ঝটিকাপাত, আকালিক বর্ষ বৃষ্টি বিদ্যুৎ ও মেঘগর্জ্জন, ভূমিকম্প, উল্কাপাত ও দিকদাহে অনধ্যায়। গ্রামের মধ্যে মৃতদেহ পড়িয়া আছে, দাহ হয় নাই, সে সময়ে অনধ্যায়। যুদ্ধকাল বাদ্যধ্বনি ও শৃগাল কুক্কুরাদির চিৎকারে পাঠ নিষিদ্ধ। শূদ্র ও পতিত লোকের সম্মুখে পাঠ নিষিদ্ধ। দেবমন্দির শ্মশান চতুষ্পথ ও রথ্যায় পড়িত না। কোন রূপ যান বাহনে যাইবার সময় পাঠ নিষিদ্ধ। ছাত্রের বমন বিরেচন ও অজীর্ণ এই তিন অবস্থায় পাঠ নিষিদ্ধ। দেশের রাজা বেদপারগ বিপ্র,গো ও ব্রাহ্মণের কোনরূপ বিপদ হইলে পড়িত না। রাত্রি-শেষে অধ্যয়ন করিয়া পুনর্ব্বার শয়ন অবৈধ। এই সমস্ত অনধ্যায়কালে পঠিত গ্রন্থের আলোচনা হইত এবং ছাত্রেরা ইহা দ্বারা বিশেষ ব্যুৎপত্তি লাভ করিত।

শ্যামবাজার ব্রাহ্মসমাজ।

দ্বাবিংশ সাম্বৎসরিক উৎসব উপলক্ষে
শ্রীযুক্ত ভৈরবচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়
মহাশয়ের উপদেশ।

প্রাতঃকাল।

ব্রহ্মজ্ঞানরূপ স্বর্গীয় অগ্নি সকল আত্মাতেই অবিনশ্বর অক্ষরে লিখিত আছে। ব্রহ্মজ্ঞানকে অগ্নির সহিত কি নিমিত্ত তুলনা করা হইল—অগ্নিতে ও ব্রহ্মজ্ঞানে কোন্ বিষয়ে সৌসাদৃশ্য আছে। অগ্নির কি গুণ তাহা দেখিতে গেলে সামান্যতঃ তিনটী প্রধান বলিয়া উপলব্ধ হয়; প্রথমতঃ উত্তাপ, উত্তাপের অভাবে জড় জগতে কোন পদার্থই জীবিত থাকিতে বা বর্দ্ধিত হইতে পারে না, উত্তাপব্যতিরেকে জীব মাত্রেরই জীবন নষ্ট হয়, হিমকলেবর মৃত্যুর এক প্রধান চিহ্ন। উত্তাপ ব্যতিরেকে যে কেবল জীব জন্তু কেহ বাঁচিতে পারে না তাহা নহে—বৃক্ষ, লতা, পুষ্প, গুল্ম প্রভৃতি কোন প্রকার উদ্ভিদ্ও জন্মিতে বা জীবিত থাকিতে পারে না। সূর্য্যের উত্তাপ সম্যকরূপে প্রাপ্ত না হইলে পুষ্প বিকশিত হয় না, ফল পরিপক্ক হয় না, পত্রাদি রমণীয় শোভা ধারণ করে না, এমন কি উত্তাপের অভাবে ক্ষুদ্র তৃণ পর্য্যন্ত জন্মিতে পারে না। এই রূপে যেমন দেখি যে উত্তাপ বহির্জগতের জীবন এবং উত্তাপ ভিন্ন মনুষ্য, পশু, পক্ষী, কীট, পতঙ্গ, বৃক্ষ, লতা, পুষ্প প্রভৃতি কিছুই জীবিত থাকিতে পারে না—কাহারই প্রাণ রক্ষা হয় না; সেইরূপ ব্রহ্মজ্ঞান আত্মার প্রকৃত জীবন, ব্রহ্মজ্ঞান ব্যতিরেকে আত্মা এক মুহূর্ত্তের নিমিত্ত জীবিত থাকিতে পারে না; ব্রহ্মজ্ঞান-বিহীন আত্মা আত্মাই নহে; ব্রহ্মজ্ঞান-শূন্য আত্মা নির্জ্জীব পদার্থের মধ্যে পরিগণিত হয়, কোন কালেই তাহার বিকাশ বা স্ফূর্ত্তি সম্ভবে না।

হীনবল হইয়া ধর্ম্মের নিকট পরাভূত হয়। তখন আর আত্মার বিকার থাকে না, পৃথিবীতে অমঙ্গল অশান্তি বিরাজ করিতে পারে না, তখন পুণ্যের প্রভাব, ধর্ম্মের বল সর্ব্বত্র বিস্তৃত হইয়া আত্মাতে ঈশ্বরের রাজ্য সংস্থাপন করে। তখন সকল স্থানেই ঈশ্বরের জয়, ধর্ম্মের জয়, সত্যের জয়, বিঘোষিত হইতে থাকে। ভক্তি, শ্রদ্ধা, প্রীতির প্রবাহে শুষ্ক নীরস আত্মা আর্দ্র ও রসপূর্ণ হয়—অবিশ্বাসী শোক-সন্তপ্ত এবং দীনভাবে মুহ্যমান আত্মা অটল বিশ্বাসরূপ দুর্ভেদ্য কবচে সংরক্ষিত হইয়া প্রেমে ও ঈশ্বর-ভাবে পূর্ণ হয়, এবং করুণাময়ের আবির্ভাবে পাপ তাপ হইতে মুক্ত হইয়া বিগতশোক হয়, জীবের পরম গতি পরমেশ্বরকে পাইয়া ভূমা আনন্দ লাভ করে, ক্ষণস্থায়ী তুচ্ছ আপাত-মনোরম পার্থিব সুখের জন্য আর শোক করে না।

ব্রাহ্ম ভ্রাতৃগণ! এই ব্রহ্মজ্ঞানরূপ স্বর্গীয় অগ্নি আমাদের আত্মাতে যে অবস্থিতি করিতেছে তাহা যেন সর্ব্বদা প্রদীপ্ত ও প্রজ্বলিত থাকে, আমাদিগের কর্ম্মদোষে যেন তাহা নির্ব্বাপিত না হয়। করুণাময় পরমেশ্বর সর্ব্বত্রই সমান ভাবে বিরাজ করিতেছেন। তাঁহার চন্দ্র সূর্য্য যেমন সকলেরই নিকট আপন জ্যোতি প্রকাশ করিতেছে, ধনী, নির্ধন, মূর্খ, পণ্ডিত, সাধু, অসাধু কেহই যেমন দিনকর বা হিমকরের আলোক লাভে বঞ্চিত হয় না, সেইরূপ কোন অবস্থার কোন ব্যক্তিই সেই বিশতশ্চক্ষু জ্যোতির্ম্ময় পরমেশ্বরের বিমল জ্যোতিঃ লাভে বঞ্চিত হয় না। তাঁহার পবিত্র আলোক সকল আত্মাতেই সমভাবে প্রদীপ্ত রহিয়াছে; কিন্তু যেমন চন্দ্র সূর্য্যের আলোক নিয়ত প্রদীপ্ত থাকিলেও আমরা নিমীলিত নয়নে তাহা দৃষ্টি করিতে সক্ষম হই না, সেইরূপ ব্রহ্মজ্ঞানরূপ স্বর্গীয় আলোক সকল সময়েই প্রজ্বলিত রহিয়াছে, তাহার দীপ্তি কখনও ম্রিয়মাণ বা নির্ব্বাপিত না হইলেও আমরা মোহান্ধতা বশতঃ, বা প্রেম-চক্ষু উন্মীলন না করা প্রযুক্ত জ্যোতির্ম্ময়ের সে বিমল জ্যোতিঃ অনুভব করিতে অক্ষম হই। ভ্রাতৃগণ, যদিও এত দিন মোহান্ধকারে আচ্ছন্ন হইয়া থাকি, এত দিন যদিও তাঁহাকে আত্মার অধিষ্ঠাত্রী দেবতা আমাদিগের চিরন্তন ধন বলিয়া না জানিয়া থাকি, আমরা যেন অদ্যকার এই সাম্বৎসরিক সমাজ হইতে নূতন জীবন প্রাপ্ত হই, তাঁহাকে সর্ব্বকাল সকল অবস্থায় সমানভাবে হৃদয়ে ধারণ করিতে শিক্ষা করি। দিকহারা নাবিকের ধ্রুব-তারার ন্যায় তাঁহাকে যেন সর্ব্বদা আমাদিগের পথ-প্রদর্শক বলিয়া জানি, তিনি আমাদিগের এক মাত্র নেতা, তিনিই এক মাত্র পাপের মোচয়িতা ও আত্মার আলোক, তিনি যেন চির দিন আমাদের একমাত্র লক্ষ্য থাকেন, এবং তাঁহাকে হৃদয়ে ধারণ করিয়া তাঁহার প্রসাদে, তাঁহার আলোকেই তাঁহাকে দেখি; তিনি আমাদিগের অন্তরে যে ব্রহ্মজ্ঞান এবং প্রেম ভক্তি বিশ্বাস সংস্থাপন করিয়াছেন তাহা যেন চিরদিন স্থির ভাবে অচল ও অটল ভাবে আত্মাতে বিরাজিত থাকে, তাঁহাকে প্রাপ্তি ভিন্ন অন্য কোন বাসনা যেন আমাদের মনে স্থান না পায়।

ওঁ একমেবাদ্বিতীয়ং।

শ্যামবাজার ব্রাহ্মসমাজ।

শ্রীযুক্ত দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়ের উপদেশ।

অহঙ্কার এবং ঈশ্বর-প্রেম।

বিশুদ্ধ জ্ঞানের প্রথম সোপান আপনাকে জানা এবং তাহার চরম ফল ঈশ্বরকে জানা। সকল দেশের তত্ত্বজ্ঞানীর মুখেই পুনঃ পুন এই উপদেশ শুনিতে পাওয়া

যায়—"আপনাকে জানো"। আপনাকে জানিতে হইলে এমন একটি স্থানে দাঁড়ানো উচিত, যেখান হইতে আপনার ভাল-মন্দ সমস্তই দেখিতে পাওয়া যায়। অহঙ্কার সেই স্থান। দিবা-রাত্রির মধ্যস্থলে যেমন সন্ধ্যা অবস্থিতি করে, সেইরূপ আমাদের মনের ভাল-মন্দের মধ্যস্থলে অহঙ্কার অবস্থিতি করে;—এ জন্য অহঙ্কার কতটুকু ভাল, কতটুকু মন্দ তাহা ঠিক্ করা সুকঠিন। পরোপকার, বিদ্যানুশীলন, কর্ম্মিষ্ঠতা এই সমস্ত ভাল বস্তুর সঙ্গেও অহঙ্কার জড়িত থাকে, আবার, নর-হত্যা, স্বেচ্ছাচার, প্রতারণা, প্রবঞ্চনা এ সমস্ত মন্দ বস্তুর সঙ্গেও অহঙ্কার জড়িত থাকে। সহসা কাহাকেও এমন উপদেশ দিতে পারা যায় না যে, "তুমি অহঙ্কার পরিত্যাগ কর,"—এমনও উপদেশ দিতে পারা যায় না যে, "তুমি অহঙ্কার পোষণ কর।" অহঙ্কার নাকি বৈষয়িক অন্তঃকরণের মধ্য প্রদেশ, এজন্য আপনাকে জানিতে হইলে অহঙ্কারটিকে ভাল করিয়া চেনা আবশ্যক।

অহঙ্কার এমনি একটি স্থান যে, তাহাকে ছাড়াইয়া উপরে উঠিলে সত্যের দ্বারে পৌঁছানো যায়, আর, সেখান হইতে নীচে নামিলে মূঢ়তার গ্রাসে নিপতিত হইতে হয়। আমরা যত্ন-পূর্ব্বক যে কোন কার্য্য করি, তাহার সঙ্গে সঙ্গে "আমি করিতেছি" বলিয়া সেই কার্য্যের একটি বিশেষ মূল্য আমাদের চক্ষে প্রতিভাত হয়। আমরা যখন মনে মনে কোন বিষয়ের সংকল্প করি, আর, কিয়ৎকাল পরে তাহাকে যখন আমরা কোন একটি কার্য্যে ফলিত করি, তখন সেই কার্য্যের দর্পণে আমরা আপনাকে প্রতিবিম্বিত দেখিয়া গর্ব্বিত হই,—এইরূপ, আপনার কার্য্যের মধ্যে আপনাকে দেখা অহঙ্কারের লক্ষণ, "অহঙ্কর্ত্তা" এইরূপ বোধের নামই অহঙ্কার। যদি আমরা কোন কার্য্য না করি বা কার্য্য করিবার অভিলাষ না রাখি, তবে আমরা অহঙ্কার হইতে মুক্তি পাইতে পারি বটে; কিন্তু তাহা করিলে অহঙ্কার ছাড়াইয়া উপরে ওঠা হয় না, অহঙ্কার হইতে আরো নীচে নাবিয়া যাওয়া হয়,—সেখানে নিশ্চেষ্টতা এবং মূঢ়তা আসিয়া আমাদিগকে আক্রমণ করে। জড়তা এবং মূঢ়তা অপেক্ষা অহঙ্কার ভাল বটে, কিন্তু তাহা বলিয়া তাহা যে সর্ব্বাংশে ভাল তাহা নহে। একদিকে যেমন অহঙ্কার কার্য্যের উৎপাদক, আর এক দিকে তেমনি তাহা কার্য্যের সংহারক। আমরা আপনার কৃত কার্য্য মনে মনে রোমন্থন করিয়া যতটা সময় নষ্ট করি, ততটা সময় সৎকার্য্যে ব্যয় করিলে অনেক ফল ফলিতে পারে। "আমি করিতেছি" এ ভাবটি আমাদের মনোমধ্যে যত প্রচ্ছন্ন থাকে, ততই কাজ ভাল হয়; আর, যতই তাহা আমাদের চক্ষের সামনে আসিয়া দাঁড়ায়, ততই আমাদের মূল উদ্দেশ্যকে আড়ালে ফেলিয়া আমাদের ইষ্টসিদ্ধির ব্যাঘাত জন্মায়। ইউরোপে সাধারণ-তন্ত্র প্রচলিত করিবার জন্য যে হস্তে নেপোলিয়ন বিশ্ব-বিজয়ী মন্ত্রপূত অসি ধারণ করিয়াছিলেন—অবশেষে তিনি সেই হস্তে আপনার মস্তকে রাজ-মুকুট আরোপণ করিলেন,—ইহা কিরূপ কার্য্য? হায়! নেপোলিয়ন এবং তাঁহার মূল অভিসন্ধির মধ্যস্থলে অহঙ্কার রূপ তমো আবির্ভূত হইয়া তাঁহার কার্য্য-সিদ্ধির একেবারেই মূল বিধ্বস্ত করিয়া দিল। এই সকল দেখিয়া অহঙ্কারকে প্রশ্রয় দিতে মঙ্গলেচ্ছু ব্যক্তির সতর্ক হওয়া উচিত। যশোলিপ্সা সৎকার্য্যের একটি প্রবল উত্তেজক—ইহা খুবই সত্য, কিন্তু তাহা বলিয়া তাহাকে স্বানুষ্ঠিত কার্য্যের মূল উদ্দেশ্যের স্থান অধিকার করিতে দেওয়া কোনমতেই উচিত হয় না। টাকার যেমন এক

হিসাবে মূল্য আছে এক হিসাবে কোন মূল্যই নাই, যশেরও ঠিক্ সেইরূপ। এক জন রবিন্‌সন্ ক্রুসোর নিকট সহস্র মুদ্রা অপেক্ষা এক মুষ্টি ধান্য সহস্র গুণ মূল্যবান্,—পথ-হারা ঈশ্বরান্বেষী ব্যক্তির নিকট সহস্র-যোজন-ব্যাপী যশ অপেক্ষা তিলপ্রমাণ ঈশ্বর-প্রেম সহস্র গুণ মূল্যবান্। টাকা যেমন দেহের পুষ্টি-সাধক খাদ্য-সামগ্রী নহে, যশও সেইরূপ হৃদয়ের পুষ্টি-সাধক অন্ন নহে। উভয়ই সাক্ষাৎ সম্বন্ধে কিছুই নহে,—কেবল সংসার-কার্য্যের প্রবর্ত্তক হওয়াতেই উভয়ের যত কিছু মাহাত্ম্য। যশস্বী ব্যক্তি লোককে সৎ দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করিয়া সৎপথে প্রবৃত্ত করিতে পারেন বলিয়াই যশের এত মহিমা;—নচেৎ যশকে কেহ সঙ্গে করিয়া আনেনও নাই কেহ সঙ্গে লইয়া যাইবেনও না। যথার্থই যদি কোন ব্যক্তির কোন অসাধারণ ক্ষমতা বা সদ্গুণ থাকে তবে লোকে তাহা জানিলে ভাল হয়, কেননা তাহা হইলে সে সদ্গুণ বা ক্ষমতা অন্ধকারাচ্ছন্ন হইয়া বিফলে যায় না—লোক-সমাজে রীতিমত স্ফূর্ত্তি পাইতে পায়; এই খানেই যশের আবশ্যকতা—এই খানেই যশের সার্থকতা। যশ বল, খ্যাতি বল, মান মর্য্যাদা বল, সমস্তই আপনার এবং অন্যের মঙ্গল-সাধনের জন্যই আবশ্যক, আপনার কার্য্যে আপনাকে প্রতিবিম্বিত দেখিবার জন্য নহে। অর্থ-কৃপণ ব্যক্তি বসিয়া বসিয়া লোহার সিন্ধুকের টাকায় টাকায় আপনার প্রতিবিম্ব অবলোকন করেন,—"আমিই ইহার স্বামী" এই তত্ত্বটি অবলোকন করেন। যশঃকৃপণ ব্যক্তি বসিয়া বসিয়া আপনি কবে কি কার্য্য করিয়াছেন ও তদুপলক্ষে কবে কোন্ সংবাদ পত্রে কি বলিয়াছে, তাহাতে আপনাকে প্রতিবিম্বিত দেখেন,—দেখেন যে ঐ কার্য্য-গুলির আমিই কর্ত্তা। যশ কিছু মন্দ সামগ্রী নহে; যশের সাহায্যে গুণবান্ এবং ক্ষমতাবান্ ব্যক্তিরা আপনাদের গুণ এবং ক্ষমতা দূর-দূর দেশ পর্য্যন্ত অনেকের মনে উদ্বোধিত করিয়া দিয়া পৃথিবীর অনেক উপকার সাধন করেন—আরো করিতে পারিতেন যদি অহঙ্কার সম্মুখে আসিয়া তাঁহাদের মূল অভিসন্ধিকে আড়াল করিয়া না দাঁড়াইত। যশের সম্মুখে যখন অহঙ্কার আসিয়া অভীষ্ট মঙ্গল কার্য্যের পথ রোধ করিয়া দণ্ডায়মান হয়, তখনই তাহার গাত্রে দোষ পোঁছে। পৃথিবীর মহাত্মারা স্বীয় কার্য্যকে দূরবীক্ষণ করিয়া তাহার মধ্য দিয়া ভাবী মঙ্গলের রাজ্য প্রত্যক্ষ করেন—সে রাজ্যে তিনি আপনার নাম দেখিতে পা'ন না—সেই নাম দেখেন যিনি "নামরূপের নির্ব্বাহকর্ত্তা"—যে নাম চিরকালই আছে এবং চিরকালই থাকিবে,—ঈশ্বরপ্রেমী ব্যক্তি মৃত্যু-কালেও যে নাম হৃদয়ের ভিতর করিয়া লইয়া যাইতে পারে! কিন্তু যে ব্যক্তি আপনার কার্য্যকে দর্পণ করিয়া তাহাতে কেবল আপনারই নাম দেখিতে থাকেন, তিনি কি দেখেন? দর্পণে ফুৎকার দিলে তাহাতে যে এক রত্তি মেঘের সঞ্চার হয় তাহাই দেখেন—তাহা কিছুই নহে।

আমাদের মন যদি বৃথা অহঙ্কারের রাজ্য ছাড়াইয়া ঈশ্বর-প্রেমের রাজ্যে উত্থান করিতে পারে, তবে এমন একটি নিরাপদ কূল প্রাপ্ত হয় যেখানে মিথ্যার তরঙ্গ পোঁছিতে পারে না। সেখানে ইন্দ্রিয়াতিগ এবং নিরহঙ্কার সত্য আমাদিগকে আলিঙ্গন করিবার জন্য ক্রোড় প্রসারিত করিয়া রহিয়াছে। এখানে আমরা ইন্দ্রিয়ের বশবর্ত্তী হইয়া যে কোন কার্য্য করি, সে সত্যের নিকটে তাহা আমলে আসে না, অহঙ্কারের বশবর্ত্তী হইয়া যে কোন কার্য্য করি তাহাও আমলে আসে না,—আমরা বিশুদ্ধ অন্তঃ-

করণে, বিশুদ্ধ অভিপ্রায়ে যে কোন কার্য্য করি তাহাই সেখানে পৌঁছিতে পায়। সত্য যখন ইন্দ্রিয়-পরায়ণ ব্যক্তিকে জিজ্ঞাসা করিবেন যে, তুমি চিরস্থায়ী আমাকে ছাড়িয়া ক্ষণস্থায়ী ইন্দ্রিয়সুখকে সার করিলে? ইন্দ্রিয়-পরায়ণ ব্যক্তি তাহার কি উত্তর দিবে? কিছুই না। সত্য যখন অহঙ্কারী ব্যক্তিকে জিজ্ঞাসা করিবেন যে তোমার কিই এমন বিজ্ঞতা—কতদিনকার বহুদর্শিতা যে, তুমি আমাকে ছাড়িয়া তোমার আপনার বুদ্ধিমত্তাকে সার করিয়াছ! তোমার বুদ্ধি কতটুকু—তোমার বল কতটুকু—তোমার জ্ঞান জন্মিয়াছে কতটুকু সময়ের মধ্যে—তোমার পরীক্ষার আয়তন সৌর জগতের কতটুকু অংশ—অহঙ্কারী ব্যক্তি ইহার কি উত্তর দিবেন? কিছুই না! কি ইন্দ্রিয়াসক্ত ব্যক্তির সুখস্বপ্ন—কি অহঙ্কারের স্বকপোল-কল্পিত স্বপ্রধানতা—সত্যের নিকটে উভয়ের কাহারো এক কড়াও মূল্য নাই। মূল সত্য ইন্দ্রিয়ের বশীভূত নহে, মূল সত্য ইন্দ্রিয়াতিগ;—মূল সত্য কোন ব্যক্তি-বিশেষের মনঃকল্পনার বশীভূত নহে, মূল সত্য অভিমানশূন্য। অতএব এ কথাটি অতীব সত্য যে, ইন্দ্রিয়াসক্তি এবং অহঙ্কার ছাড়াইয়া না উঠিলে কোন-প্রকারেই ঈশ্বরপ্রেমের নাগাল পাওয়া যাইতে পারে না।

সকল শাস্ত্রেই বলে যে, মনঃসংযম করা ঈশ্বর-সান্নিধ্য-লাভের একটি প্রধান উপায়। মনঃসংযম করিতে হইলে মনের দুই দিকে দৃষ্টিপাত করা আবশ্যক—কামনা বাসনা ও প্রবৃত্তির দিক্ এবং অহঙ্কারের দিক্। প্রবৃত্তি দমন করিবার সঙ্গে সঙ্গে মনে এই যে এক অহঙ্কার উপস্থিত হয় যে, "আমি প্রবৃত্তি দমন করিতেছি" এই অহঙ্কারটিকেও দমন করা উচিত। ইন্দ্রিয়াসক্তি সাক্ষাৎ তমোগুণ, অহঙ্কার সাক্ষাৎ রজোগুণ; দুইকে ছাড়াইয়া উঠিলে তবেই সত্ত্বগুণের নির্ম্মল আকাশ প্রাপ্ত হওয়া যায়;—সেইখানেই আমরা সত্যং জ্ঞানমনন্তং ব্রহ্মের সান্নিধ্য উপলব্ধি করিতে পারি।

ঈশ্বরের প্রেমময় সান্নিধ্য আমাদের অন্তঃকরণের স্পর্শমণি। তাহাতে আমাদের বিষয়-লালসা শান্ত হইয়া যায়, অহঙ্কার প্রেমকে আপনার সিংহাসন ছাড়িয়া দিয়া আপনি তাহার কিঙ্কর হইয়া করযোড়ে এক-পার্শ্বে দণ্ডায়মান হয়। তখন আমাদের কার্য্য আর একরূপ হইয়া দাঁড়ায়। তখন আমরা আমাদের ঠিক অধিকারটি বুঝিতে পারি, ও সেই অধিকারটির ভালরূপ সদ্ব্যবহার করিয়া ক্রমে ক্রমে উন্নতির দিকে অগ্রসর হই। বড় হইবার ইচ্ছা সকল লোকেরই আছে—কিন্তু সকল লোকের অধিকার কিছু আর সমান নহে। অহঙ্কারী ব্যক্তি-মাত্রই মনে করেন যে, আমি সকল অপেক্ষা বড়; ডন্‌কুইক্‌সোট্ মনে করিতেন যে, আমার মত বীর-পুরুষ আর জগতে নাই,—কেহ বা মনে করিতেন যে, আমিই ঈশ্বরের প্রিয়তম পুত্র—ইয়ুদী জাতি মনে করেন যে, পৃথিবীস্থ সমস্ত জাতির মধ্যে আমরাই একা কেবল ঈশ্বরের মনোনীত,—এ তো কেবল জনের জনের মনের কল্পনা, কিন্তু সত্য কি? সত্য যাহা তাহা অতি সুন্দর,—তাহা এই;—সকল লোকেরই এক একটি অধিকার নির্দ্দিষ্ট আছে, সে অধিকার কার্য্য-দ্বারা বাড়ানো কমানো যায়। ঈশ্বর-প্রেমের রশ্মি যে ভাগ্যবান্ পুরুষের হৃদয়কে স্পর্শ করিয়াছে, তিনি আপনার অধিকারের মধ্যেই সেই প্রেমোচিত কার্য্য করিয়া রাজাধিরাজ অপেক্ষাও আপনাকে কৃতকার্য্য মনে করেন—আপনার অধিকার উল্লঙ্ঘন করাতে তিনি এক বিন্দুও স্বার্থ দেখিতে পান না। লোকে তাঁহাকে বড় বলুক বা না বলুক্ তিনি আপ-

নার অধিকারের যথোচিত সদ্ব্যবহার করিয়া ক্রমশই তিনি মহত্ত্বের দিকে অগ্রসর হ'ন। ঈশ্বর যাঁহাকে যে শ্রেণীতে নিক্ষেপ করিয়াছেন—তিনি সেই শ্রেণীর পরীক্ষা উত্তীর্ণ হইলেই ঈশ্বর তাঁহাকে আপনি উচ্চ শ্রেণীতে উঠাইয়া দেন;—এ বিষয়ে আর সন্দেহমাত্র নাই।

ওঁ একমেবাদ্বিতীয়ং।

কাজের লোক কে?

(বালক হইতে উদ্ধৃত)

আজ প্রায় চার-শ বৎসর হইল পঞ্জাবে তলবন্দী গ্রামে কালু বলিয়া একজন ক্ষত্রিয় ব্যবসা বাণিজ্য করিয়া খাইত। তাহার এক ছেলে নানক। নানক কিছু নিতান্ত ছেলেমানুষ নহে। তাহার বয়স হইয়াছে, এখন কোথায় সে বাপের ব্যবসা বাণিজ্যে সাহায্য করিবে তাহা নহে—সে আপনার ভাবনা লইয়া দিন কাটায়, সে ধর্ম্মের কথা লইয়াই থাকে।

কিন্তু বাপের মন টাকার দিকে, ছেলের মন ধর্ম্মের দিকে—সুতরাং বাপের বিশ্বাস হইল এ ছেলেটার দ্বারা পৃথিবীর কোন কাজ হইবে না। ছেলের দুর্দ্দশার কথা ভাবিয়া কালুর রাত্রে ঘুম হইত না। নানকেরও যে রাত্রে ভাল ঘুম হইত তাহা নহে, তাহারও দিনরাত্রি একটা ভাবনা লাগিয়া ছিল।

বাবা যদিও বলিতেন ছেলের কিছু হইবে না, কিন্তু পাড়ার লোকেরা তাহা বলিত না। তাহার একটা কারণ বোধ করি এই হইবে যে, নানকের ধর্ম্মে মন থাকাতে পাড়ার লোকের বাণিজ্য-ব্যবসার বিশেষ ক্ষতি হয় নাই। কিন্তু বোধ করি তাহারা নানকের চেহারা নানকের ভাব দেখিয়া আশ্চর্য্য হইয়াছিল। এমন কি নানকের নামে একটা গল্প রাষ্ট্র আছে। গল্পটা যে সত্য নয় সে আর কাহাকেও বলিতে হইবে না। তবে, লোকে যেরূপ বলে তাহাই লিখিতেছি। একদিন নানক মাঠে গরু চরাইতে গিয়া গাছের তলায় ঘুমাইয়া পড়িয়াছিলেন। সূর্য্য অস্ত যাইবার সময় নানকের মুখে রোদ লাগিতেছিল। শুনা যায় না কি একটা কালো সাপ নানকের মুখের উপর ফণা ধরিয়া রোদ্ আড়াল করিয়াছিল। সে দেশের রাজা সে সময়ে পথ দিয়া যাইতেছিলেন—তিনি নাকি স্বচক্ষে এই ঘটনা দেখিয়াছিলেন। কিন্তু আমরা রাজার নিজের মুখে এ কথা শুনি নাই—নানকও কখন এ গল্প করেন নাই—এবং এমন পরোপকারী সাপের কথাও কখন শুনি নাই—শুনিলেও বড় বিশ্বাস হয় না।

কালু অনেক ভাবিয়া স্থির করিলেন নানক যদি নিজের হাতে ব্যবসা আরম্ভ করেন তবে ক্রমে কাজের লোক হইয়া উঠিতে পারেন। এই ভাবিয়া তিনি নানকের হাতে কিছু টাকা দিলেন—বলিয়া দিলেন "এক গাঁয় লুণ কিনিয়া আর এক গাঁয়ে বিক্রয় করিয়া আইস।" নানক টাকা লইয়া বালসিন্ধু চাকরকে সঙ্গে করিয়া লুণ কিনিতে গেলেন। এমন সময়ে পথের মধ্যে কতকগুলি ফকিরের সঙ্গে নানকের দেখা হইল। নানকের মনে বড় আনন্দ হইল! তিনি ভাবিলেন এই ফকিরদের কাছে ধর্ম্মের বিষয় জানিয়া লইবেন। কিন্তু কাছে গিয়া যখন তাহাদিগকে কথা জিজ্ঞাসা করিলেন তখন তাহারা কথার উত্তর দিতে পারে না। তিন দিন তাহারা খাইতে পায় নাই—এমনি দুর্ব্বল হইয়া গিয়াছে যে মুখ দিয়া কথা সরে না। নানকের মনে বড় দয়া হইল। তিনি কাতর হইয়া তাঁহার চাকরকে বলিলেন "আমার বাপ কিছু লাভের জন্য আমাকে লুণের ব্যবসা করিতে হুকুম করিয়াছেন। কিন্তু এ

লাভের টাকা কতদিনই বা থাকিবে! দুই দিনেই ফুরাইয়া যাইবে, আমার বড় ইচ্ছা হইতেছে এই টাকায় এই গরিবদের দুঃখ মোচন করিয়া, যে লাভ চিরদিন থাকিবে সেই পুণ্য লাভ করি।" বালসিন্ধু কাজের লোক ছিলেন বটে কিন্তু নানকের কথা শুনিয়া তাহার মন গলিয়া গেল। সে কহিল "এ বড় ভাল কথা।" নানক তাঁহার ব্যবসার সমস্ত টাকা ফকিরদের দান করিলেন। তাহারা পেট ভরিয়া খাইয়া যখন গায়ে জোর পাইল, তখন নানককে ডাকিয়া ঈশ্বরের কথা শুনাইল। তাহারা নানককে বুঝাইয়া দিল—ঈশ্বর কেবল একমাত্র আছেন আর সমস্ত তাঁহারই সৃষ্টি। এ সকল কথা শুনিয়া নানকের মনে বড় আনন্দ হইল।

তাহার পরদিন নানক বাড়ি ফিরিয়া আসিলেন। কালু জিজ্ঞাসা করিলেন "কত লাভ করিলে?" নানক বলিলেন "বাবা, আমি গরিবদের খাওয়াইয়াছি। তোমার এমন ধন লাভ হইয়াছে যাহা চিরকাল থাকিবে।" কিন্তু সেরূপ ধনের প্রতি কালুর বড় একটা লোভ ছিল না। সুতরাং সে রাগিয়া ছেলেকে মারিতে লাগিল। এমন সময়ে সে প্রদেশের ক্ষুদ্র রাজা পথ দিয়া যাইতেছিলেন। তাঁহার নাম রায়বোলার। নানককে মারিতে দেখিয়া তিনি ঘরে প্রবেশ করিলেন। জিজ্ঞাসা করিলেন "কি হইয়াছে? এত গোল কেন?" যখন সমস্ত ব্যাপার শুনিলেন তখন তিনি কালুকে খুব করিয়া তিরস্কার করিলেন। বলিলেন "আর যদি কখন নানকের গায়ে হাত তোল ত দেখিতে পাইবে।" এমন কি রাজা অত্যন্ত ভক্তির সহিত নানককে প্রণাম করিলেন। লোকে বলে যে, যখন সাপ নানককে ছাতা ধরিয়াছিল তখন রাজা তাহা দেখিয়াছিলেন এই জন্যই নানকের উপর তাঁহার এত ভক্তি হইয়াছিল। কিন্তু সে সাপের ছাতাধরা সমস্তই গুজব—আসল কথা নানকের সমস্ত বৃত্তান্ত শুনিয়া রাজা বুঝিতে পারিয়াছিলেন যে নানক একজন মস্ত লোক। নানুকের উপর আর ত মারধোর চলে না। কালু অন্য উপায় দেখিতে লাগিলেন।

জয়রাম নানকের ভগিনীপতি। পাঠান দৌলৎ খাঁর শস্যের গোলা জয়রামের জিম্মায় ছিল। কালু স্থির করিলেন নানককেও জয়রামের কাজে লাগাইয়া দিবেন—তাহা হইলে ক্রমে নানক কাজের লোক হইয়া উঠিবেন। নানকের বাপ যখন নানকের কাছে এই প্রস্তাব করিলেন, তখন তিনি বলিলেন "আচ্ছা।" এই বলিয়া নানক সুলতানপুরে জয়রামের কাছে গিয়া উপস্থিত। সেখানে দিনকতক বেশ কাজ করিতে লাগিলেন। সকলের উপরেই তাঁহার ভালবাসা ছিল এইজন্য সুসতানপুরের সকলেই তাঁহাকে ভালবাসিতে লাগিল। কিন্তু কাজে মন দিয়া নানক তাঁহার আসল কাজটি ভুলেন নাই, তিনি ঈশ্বরের কথা সর্ব্বদাই ভাবিতেন।

এমন কিছুকাল কাটিয়া গেল। একদিন সকালে নানক একলা বসিয়া ঈশ্বরের ধ্যান করিতেছেন, এমন সময়ে একজন মুসলমান ফকির আসিয়া তাঁহাকে বলিল—"নানক, তুমি আজ-কাল কি লইয়া আছ বল দেখি? এ সকল কাজকর্ম্ম ছাড়িয়া দাও। চিরদিনের যে যথার্থ ধন তাহাই উপার্জ্জনের চেষ্টা কর।"—ফকির যাহা বলিলেন তাহার অর্থ এই যে, ধর্ম্ম উপার্জ্জন কর—পরের উপকার কর—পৃথিবীর ভাল কর—ঈশ্বরে মন দাও—টাকা রোজকার করিয়া পেট ভরিয়া খাওয়ার চেয়ে ইহাতে বেশী কাজ দেখে।

ফকিরের এই কথাটা হঠাৎ এমনি নানকের মনে লাগিল, যে তিনি চমকিয়া উঠি-

লেন, ফকিরের মুখের দিকে একবার চাহিয়া দেখিলেন ও মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িলেন। মূর্চ্ছা ভাঙ্গিতেই তিনি গরীব লোকদিগকে ডাকিলেন ও শস্য যাহা কিছু ছিল সমস্ত তাহাদিগকে বিলাইয়া দিলেন। নানক আর ঘরে থাকিতে পারিলেন না। কাজ-কর্ম্ম সমস্ত ছাড়িয়া দিয়া তিনি পলাইয়া গেলেন!

নানক পলাইলেন বটে কিন্তু অনেক লোক তাঁহার সঙ্গ লইল। যাঁহার ধর্ম্মের দিকে এত টান, এমন মধুর ভাব, এমন মহৎ স্বভাব, তিনি সকলকে ছাড়িলেও তাঁহাকে সকলে ছাড়ে না। মর্দ্দানা তাঁহার সঙ্গে গেল, সে ব্যক্তি বীণা বাজাইত, গান গাহিত। লেনা তাঁহার সঙ্গে গেল। সেই যে পুরাণো চাকর বালসিন্ধু ছেলেবেলায় নানকের সঙ্গে লুণ বিক্রয় করিয়া টাকা লাভ করিতে গিয়াছিল আজও সে নানকের সঙ্গে চলিল। এবারেও বোধ করি কিঞ্চিৎ ধন-লাভের আশা ছিল; কিন্তু যে-সে ধন নয়, সকল ধনের শ্রেষ্ঠ যে ধন সেই ধর্ম্ম। রাম-দাসও নানককে ছাড়িতে পারিল না—তাহার বয়স বেশী হইয়াছিল বলিয়া সকলে তাহাকে বলিত বুড্ঢা। আর কত নাম করিব, এমন ঢের লোক সঙ্গে গেল।

নানক যথাসাধ্য সকলের উপকার করিয়া সকলকে ধর্ম্মোপদেশ দিয়া দেশে দেশে বেড়াইতে লাগিলেন। হিন্দু মুসলমান সক-লকেই তিনি ভালবাসিতেন। হিন্দু ধর্ম্মের যাহা দোষ ছিল তাহাও তিনি বলিতেন, মুসলমান ধর্ম্মের যাহা দোষ ছিল তাহাও তিনি বলিতেন। অথচ হিন্দু মুসলমান সক-লেই তাঁহাকে ভক্তি করিত। নানক আমা-দের বাঙ্গালা দেশেও আসিয়াছিলেন। শিব-নাভু বলিয়া কোন্ এক দেশের রাজা নানা লোভ দেখাইয়া নানককে উচ্ছন্ন দিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন। কিন্তু নানক তাহাতে ভুলিবেন কেন? উণ্টিয়া রাজাকে তিনি ধর্ম্মের দিকে লওয়াইলেন। মোগল সম্রাট বাবরের সঙ্গে একবার নানকের দেখা হয়। সম্রাট নানকের সাধুভাব দেখিয়া সন্তুষ্ট হইয়া তাঁহাকে বিস্তর টাকা পুরস্কার দিতে চাহিয়া-ছিলেন, কিন্তু নানক তাহা লইলেন না—তিনি বলিলেন "যে জগদীশ্বর সকল লোককে অন্ন দিতেছেন, অনুগ্রহ ও পুরস্কার আমি তাঁহারই কাছ হইতে চাই আর কাহারো কাছে চাই না।" নানক যখন মক্কায় বেড়া-ইতে গিয়াছিলেন তখন একদিন তিনি মস্-জিদের দিকে পা করিয়া ঘুমাইতে ছিলেন। তাহাই দেখিয়া একজন মুসলমানের বড় রাগ হইল সে তাঁহাকে জাগাইয়া বলিল—"তুমি কেমন লোক হে! ঈশ্বরের মন্দিরের দিকে পা করিয়া তুমি ঘুমাইতেছ!" নানক বলিলেন, "আচ্ছা, ভাই জগতের কোন্-দিকে ঈশ্বরের মন্দির নাই একবার দেখা-ইয়া দাও!" নানক লোক ভুলাইবার জন্য কোন আশ্চর্য্য কৌশল দেখাইয়া কখনো আপনাকে মস্তলোক বলিয়া প্রচার করিতে চাহেন নাই। গল্প আছে একবার কেহ কেহ তাঁহাকে বলিয়াছিল—"আচ্ছা, তুমি যে এক-জন মস্ত সাধু—আমাদিগকে একটা কোন আশ্চর্য্য অলৌকিক ঘটনা দেখাও দেখি!" নানক বলিলেন "তোমাদিগকে দেখাইবার যোগ্য আমি কিছুই জানি না। আমি কেবল পবিত্র ধর্ম্মের কথা জানি, আর কিছুই জানি না, ঈশ্বর সত্য, আর সমস্ত অস্থায়ী।"

নানক অনেক দেশ বিদেশে ভ্রমণ করিয়া দেশে ফিরিয়া আসিয়া গৃহস্থ হই-লেন। গৃহে থাকিয়া তিনি সকলকে ধর্ম্মো-পদেশ দিতেন। তিনি কোরাণ পুরাণ কিছুই মানিতেন না। তিনি সকলকে ডাকিয়া বলিতেন এক ঈশ্বরকে পূজা কর, ধর্ম্মে মন

দাও, অন্য সকলের দোষ মার্জ্জনা কর, সকলকে ভালবাস। এইরূপ সমস্ত জীবন ধর্ম্মপথে থাকিয়া সকলকে ধর্ম্মোপদেশ দিয়া সত্তর বৎসর বয়সে নানকের মৃত্যু হয়।

কালু বেশী কাজের লোক ছিল কি কালুর ছেলে নানক বেশী কাজের লোক ছিল আজ তাহার হিসাব করিয়া দেখদেখি! আজ যে শিখজাতি দেখিতেছ, যাহাদের সুন্দর আকৃতি, মহৎ মুখশ্রী, বিপুল বল; অসীম সাহস দেখিয়া আশ্চর্য্য বোধ হয় এই শিখ্‌জাতি নানকের শিষ্য। নানকের পূর্ব্বে এই শিখ্‌জাতি ছিল না। নানকের মহৎ ভাব ও ধর্ম্মবল পাইয়া এমন একটি মহৎ জাতি উৎপন্ন হইয়াছে। নানকের ধর্ম্ম-শিক্ষার প্রভাবেই ইহাদের হৃদয়ের তেজ বাড়িয়াছে, ইহাদের শির উন্নত হইয়াছে, ইহাদের চরিত্রে ও ইহাদের মুখে মহৎভাব ফুটিয়া উঠিয়াছে। কালু যে টাকা রোজ-গার করিয়াছিল, নিজের উদরেই তাহা খরচ করিয়াছে, আর নানক যে ধর্ম্মধন উপার্জ্জন করিয়াছিলেন আজ চার-শ বৎসর ধরিয়া মানবেরা তাহা ভোগ করিতেছে! কে বেশী কাজ করিয়াছে!

সমালোচনা।

The Interpreter. Edited by P. C. Mazumdar.

ব্রাহ্মসমাজের মত ব্যাখ্যা করিবার উদ্দেশ্যে সুসময়ে বঙ্গদেশে এই ইংরাজি মাসিক পত্রিকার আবির্ভাব হইয়াছে। ব্রাহ্মসমাজ বিচ্ছিন্ন হওয়াতে ব্রাহ্মদিগের মতের অনৈক্যই সকলের চক্ষে পতিত হইতেছে, তাঁহাদের মধ্যে যে সুগভীর ঐক্য রহিয়াছে তাহা কেহ আলোচনা করিতেছেন না। এই পত্রে ব্রাহ্ম-সমাজের সেই ঐক্য সাধারণের নিকটে প্রচার করা হইবে। সম্পাদক শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত প্রতাপচন্দ্র মজুমদার সূচনায় লিখিয়াছেন, ব্রাহ্মধর্ম্মের যাহা মূল মর্ম্ম তাহাই এই পত্রের আলোচ্য, যাহা কিছু গৌণ ও ব্যক্তিবিশেষগত তাহা পরিহার করা যাইবে। যাহাতে ব্রাহ্মসমাজে সর্ব্বতোভাবে সামঞ্জস্য স্থাপিত হয়, তজ্জন্য চেষ্টা করা হইবে। যে সকল ভ্রম ও বিদ্বেষভাব থাকাতে ব্রাহ্মসমাজের উপরে ব্রহ্মের বিমল জ্যোতি বিকিরণের ব্যাঘাত সাধন করিতেছে, সে সমস্ত দূরীভূত করিয়া দেওয়া এই পত্রের মহান্ লক্ষ্য হইবে। আমরা প্রার্থনা করি প্রতাপ বাবুর এই শুভ সঙ্কল্প সিদ্ধ হয়।

প্রথম সংখ্যক "ইণ্টর্প্রিটর" পত্রের প্রবন্ধগুলি সুন্দর হইয়াছে, ইহাতে সম্পাদকের সহৃদয়তার পরিচয় পাওয়া যাইতেছে। ইহার সকল লেখার সহিত আমা-দের মতের ঐক্য হয় নাই। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অনৈক্য গুলির উল্লেখ করিবার আবশ্যক নাই। কেবল National Christianity অর্থাৎ স্বজাতীয় খৃষ্টধর্ম্ম নামক প্রবন্ধ সম্বন্ধে আমাদের মত ব্যক্ত করিতেছি। খৃষ্টধর্ম্ম এবং অন্যান্য সকল ধর্ম্মেই এমন অনেক কথা আছে, যাহা সকল জাতি সকল ধর্ম্ম সম্প্রদায়ই গ্রহণ করিতে পারে। দেবতাকে ভক্তি করা, সত্য কথা বলা বা পরোপকার করা, এগুলি কোন ধর্ম্মবিশেষের বিশেষত্ব নহে। National Christianity বলিতে যদি প্রতাপ বাবু খৃষ্টধর্ম্মের এমন কোন অংশ বা ভাবের প্রতি লক্ষ্য করিয়া থাকেন, যাহা আমাদের দেশে আমাদের জাতির মধ্যে নির্ব্বিরোধে গ্রাহ্য হইতে পারে, আমা-দের হৃদয়ে সহজেই প্রতিভাত হয়, তবে সেই অংশ-মাত্রকে খৃষ্টধর্ম্ম নাম দেওয়া যাইতে পারে না। খৃষ্ট-ধর্ম্মের যাহা মূল বিশেষত্ব তাহাই প্রকৃত খৃষ্টধর্ম্ম, তাহা কখনই আমাদের স্বজাতীয় হইতে পারে না। যিশু-খৃষ্টের রক্তে সমস্ত মানবজাতির পাপ ক্ষালিত হইয়া যাওয়া এবং এই উপায়ে ঈশ্বরের ন্যায়পরতা চরিতার্থ হওয়া, যিশুখৃষ্টকে অবলম্বন করিয়া ঈশ্বরের নিকটে উপনীত হওয়া, এই খৃষ্টধর্ম্মের মূল মর্ম্ম। এ ভাব আমাদের স্বজাতীয় বলিয়া গ্রাহ্য হইতে পারে না। আমাদের ন্যায়পরতার আদর্শ স্বতন্ত্র। আমাদের শাস্ত্রে আছে—

একঃপ্রজায়তে জন্তুরেকএব প্রলীয়তে।
একোঽনুভুংক্তে সুকৃতমেকএবতু দুষ্কৃতং।

"একাকী মনুষ্য জন্মগ্রহণ করে, একাকীই মৃত হয়; একাকীই স্বীয় পুণ্যফল ভোগ করে এবং একাকীই স্বীয় দুষ্কৃতি ফল ভোগ করে।" অতএব আমাদের দুষ্কৃতির জন্য আর কেহ দায়ী হইতে পারে না।

আমাদের শাস্ত্রে আছে—শান্তোদান্তউপরতস্তিতিক্ষুঃ সমাহিতো ভূত্বা আত্মন্যেবাত্মানং পশ্যতি।—

"ব্রহ্মবিৎ ব্যক্তি শান্ত দান্ত উপরত তিতিক্ষু ও সমাহিত হইয়া আপনাতেই পরমাত্মাকে দেখেন।" অতএব আমরা কেবল ঈশ্বর-প্রসাদে আত্মপ্রভাবে তাঁহাকে প্রাপ্ত হইতে পারি, দ্বিতীয় কোন বস্তু বা ব্যক্তিকে মধ্যবর্ত্তী করিবার আবশ্যক নাই।

তমেব বিদিত্বাতিমৃত্যুমেতি
নান্যঃ পন্থা বিদ্যতেঽয়নায়।

"তাঁহাকেই জানিয়া সাধক মৃত্যুকে অতিক্রম করে, মুক্তি প্রাপ্তির আর অন্য পথ নাই।"

অতএব খৃষ্টধর্ম্ম সম্বন্ধে আর যাহাই বলা হউক্ ইহাকে স্বজাতীয় বলা যাইতে পারে না। খৃষ্টধর্ম্মের যে সকল সত্য আমাদের গ্রহণীয় তাহা হিন্দুধর্ম্মেও আছে অতএব সে হিসাবে হিন্দুধর্ম্মকেও খৃষ্টধর্ম্ম বলিতে হয়, খৃষ্টধর্ম্মকেও হিন্দুধর্ম্ম বলিতে হয়। কিন্তু বাস্তবিক পক্ষে মূলে অনৈক্য থাকাতেই হিন্দুধর্ম্মের সহিত খৃষ্টধর্ম্মের পার্থক্য হইয়াছে।

সম্পাদক মহাশয় এই প্রবন্ধে লিখিয়াছেন "উন্নত শ্রেণীর ব্রাহ্মেরা যে প্রকৃত খৃষ্টধর্ম্মের মর্ম্ম গ্রহণ ও পরিপাক করিয়াছেন তদ্বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই।" প্রতাপ বাবু সূচনায় যে প্রতিজ্ঞা করিয়াছেন যে, "এই পত্র ব্রাহ্মসমাজের ঐক্যের উপরেই প্রতিষ্ঠিত হইবে" উল্লিখিত কথায় সে প্রতিজ্ঞা রক্ষা করা হয় নাই। আমরা উন্নত কি অবনত সে কথা হইতেছে না, কোন্ ব্রাহ্মসমাজ উন্নতির অভিমান করিয়া থাকেন তাহাও আমরা জানি না, আমরা এই পর্য্যন্ত বলিতে পারি যে খৃষ্টধর্ম্মের ভাব আদি ব্রাহ্মসমাজ আত্মসাৎ (assimilate) করেন নাই, ইহা সকলেই জানেন। এরূপ স্থলে ব্রাহ্মসমাজে খৃষ্টধর্ম্মের প্রাদুর্ভাব সম্বন্ধে সম্পাদকের উক্তি অসঙ্গত হইয়াছে। "ইণ্টর্প্রিটর" পত্রের উদ্দেশ্যের প্রতি আমাদের সম্পূর্ণ অনুরাগ আছে, পাছে এই শুভ উদ্দেশ্যের ব্যাঘাত হয় তাই এত কথা বলিতে হইল।

আদি ব্রাহ্মসমাজের নিযুক্ত কর্ম্মচারী।

সভাপতি।

শ্রীযুক্ত রাজনারায়ণ বসু

অধ্যক্ষ।

শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর (পাতুরেঘাটা)
" নীলমণি চট্টোপাধ্যায়
" বেচারাম চট্টোপাধ্যায়
" রাজারাম মুখোপাধ্যায়
" ভৈরবচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়
" কালীকৃষ্ণ দত্ত
" ঈশানচন্দ্র মুখোপাধ্যায়
" রমণীমোহন চট্টোপাধ্যায়
" সত্যপ্রসাদ গঙ্গোপাধ্যায়
" শ্রীনাথ মিত্র
" দ্বিপেন্দ্রনাথ ঠাকুর
" প্রিয়নাথ শাস্ত্রী
" প্রসন্নকুমার বিশ্বাস
" রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

সম্পাদক।

শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

সহকারী সম্পাদক ও যন্ত্রাধ্যক্ষ।

শ্রীযুক্ত নীলমণি চট্টোপাধ্যায়

তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার সম্পাদক।

শ্রীযুক্ত দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর

তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার সহকারী সম্পাদক।

শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র বিদ্যারত্ন